প্রথম প্রকাশ
মহালয়া ১৩৬৩

প্রকাশক
প্রিয়ব্রত দেব
প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
৭ জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৩

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক
নীলরতন পাল
উদিত উদ্যোগ
৪২, মহেন্দ্র গোঁসাই লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬

অনুবাদকের উৎসর্গ

সর্বাণী চৌধুরী ও

সুনন্দন চক্রবর্তীকে

স্তানিসোয়াভ লেম ও যন্ত্রমানব

স্তানিসোয়াভ লেম....

শুধু যে কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর ওস্তাদ শিল্পী, তা-ই নয়, আমাদের কালের এক গভীর-গম্ভীর আত্মা। —নিউ-ইয়র্ক টাইমস

যেন লাগামছেঁড়া কৌতুকশিল্পী। অবজ্ঞা আর ব্যঙ্গ আর তিক্ততায় মাখামাখি, জটপাকানো, ভয়ধরানো, চমকে-দেয়া, হতভম্ব-ক'রে-তোলা, আর গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে ভরপুর। —থিওডোর স্টার্জন

বিশ্বসাহিত্যের একজন প্রধান লেখক, যিনি দৈবাৎ কল্পবিজ্ঞান কাহিনী লেখেন। —ফ্যান্টাসি অ্যাণ্ড সায়ান্স ফিকশন

এই মুহূর্তে পৃথিবীর যে-কোনো ভাষায় শ্রেষ্ঠ কল্পবিজ্ঞান কাহিনী লেখক। —নিউজউইক

বিজ্ঞান জানেন এতটাই যে তা নিয়ে অবলীলাক্রমে খেলা করতে পারেন। লেম যেন বিজ্ঞাননির্ভর সংস্কৃতির হোর্হে লুইস বোর্হেস।

—টাইম

চরিত্রচিত্রণের অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে মিশেছে পাণ্ডিত্য আর হো-হো হাসির দমকা বাতাস। কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর সবচেয়ে উন্মুখর লেখক। —শিকাগো ট্রিবিউন

লেমকে যদি শতাব্দীর শেষেও কখনও নোবেল পুরস্কার না-দেয়া হয় তবে বুঝতে হবে যে কেউ নিশ্চয়ই বিচারকমণ্ডলীর কাছে গিয়ে লাগিয়েছে যে তিনি কল্পবিজ্ঞান কাহিনী লেখেন।

—ফিলাডেলফিয়া ইনকোয়ারার

এমন শিক্ষিত, সহৃদয়, সজাগ ও উত্তেজক লেখক পৃথিবীতে খুব কমই আছেন। —ওয়াশিংটন পোস্ট

আন্দ্রেই টার্কোভস্কির 'সোলারিস' চলচ্চিত্রের কাহিনীকার হিশেবেই স্তানিসোয়াভ লেম-এর নাম যখন সত্তরের দশকে আমেরিকায় পৌঁছেছিলো, আর পর-পর তর্জমা করা হয়েছিলো তাঁর গোটা দশেক বই, তখন এইভাবেই মার্কিন মুলুকে হুলুস্থুল তুলেছিলেন পোলভাষার এই দুর্ধর্ষ লেখক।

স্তানিসোয়াভ লেম জন্মেছিলেন ১৯২১-এ, 'আর. ইউ. আর' প্রকাশিত

হবার বছরে, যে-নাটকে কারেল চাপেক উদ্ভাবন করেছিলেন 'রোবোট' কথাটা। কাকতাল, কিন্তু দারুণ তাকলাগানো কাকতাল এটা, কারণ স্তানিসোয়াভ লেম-এর রচনার একটা বড়ো অংশই রোবোটদের নিয়ে।

লেম বড়ো হয়েছিলেন পোলাণ্ডের ল্ভুভ্-এ (জায়গাটা এখন উক্রেনের অংশ; এককালে যখন জার্মানির অংশ ছিলো, তখন তার নাম ছিলো লেমবার্গ)। লেম যখন ডাক্তারি শেখবার জন্যে সদ্য মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছেন, এমন সময় যুদ্ধ বাধলো, লেমকে মাঝপথেই পড়াশুনোয় ইস্তফা দিতে হ'লো (নাৎসি হানার সময়ে তিনি এক গাড়ির কারখানায় মেকানিক ও ওয়েল্ডারের কাজ নিয়েছিলেন, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে কাজ করতেন প্রতিরোধ-বাহিনীতে; একবার নাৎসিদের ফায়ারিং স্কোয়াডের হাতে পড়তে-পড়তে বেঁচে যান): তাঁর ডাক্তারি পড়া শেষ হ'লো যুদ্ধের পর ক্রাকুভের ইয়াগিলোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে (কোপারনিকাস তাঁর গবেষণার অনেকটাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পন্ন করেছিলেন; পুরোনো ক্যাম্পাসের একটা ঘরে এখনও কোপারনিকাসের ব্যবহার করা দূরবিন ইত্যাদি সযত্নে রাখা আছে)। ইয়াগিলোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে-পড়তেই লেম বিজ্ঞানের দর্শন, পপুলার সায়ান্স এইসব বিষয়ে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েন, এখানেই তাঁর পরিচয় হয় সাইবারনেটিকস বিদ্যার সঙ্গে, অর্থাৎ বিদ্যুৎচালিত বুদ্ধিপ্রখরযন্ত্রনির্মাণবিদ্যার সঙ্গে। চিকিৎসাকে পেশা না-ক'রে লেম লেখক হবেন ব'লেই স্থির করেছিলেন, ১৯৫১-তে বেরুলো তাঁর প্রথম বই 'নভোযাত্রীরা'। আর তক্ষুনি তাঁর নামে একটা ছাপ প'ড়ে গেলো; প্রথম বই থেকেই তিনি কল্পবিজ্ঞানকাহিনী অর্থাৎ সায়ান্স ফিকশনের লেখক হিশেবে পরিচিত হ'য়ে গেলেন—লোকে তাঁকে তুলনা করলে জুল ভের্ন-এর সঙ্গে। এটা, সত্যি, বেজায় অদ্ভুত যে পৃথিবীর প্রায় কোথাও কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর লেখকদের খুব-একটা গুরুত্ব দেয়া হয় না – তাঁদের ভাবা হয় ছেলেমানুষি গাঁজাখুরি বইয়ের লেখক হিশেবে, আজগুবি সব বিষয় নিয়ে সব লেখাপত্র তাঁদের, তাঁদের কারবার গ্রহ-গ্রহান্তর, অন্য জীবরূপ আর অন্য-সব সভ্যতা নিয়ে—পুরোটাই বানানো, অলীক, কৃত্রিম—নেহাৎই কারু উর্বর মস্তিষ্কের উত্তেজিত চেতনাতরঙ্গের অপ্রয়োজনীয় ফসল। ফলে মস্তান সাহিত্য-সমালোচকেরা গোড়ায় তাঁকে কোনো পাত্তাই দেয়নি, কিন্তু ক্রমে লেম-এর জনপ্রিয়তা পৌঁছুলো তুঙ্গে, বিশেষত বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে – আর সেই জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি হ'লো রাশিয়ায়, রুশী বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে—

আর সেখানেই আন্দ্রেই টারকোভস্কি লেম-এর ‘সোর’ উপন্যাস অবলম্বনে তাঁর ছবি তুললেন ‘সোলারিস’—আর দেশে-বিদেশে লেম-এর নাম ছড়িয়ে পড়লো।

লেম কিন্তু শুধু গল্প-উপন্যাসই লেখেন না—লেখেন চিত্রনাট্য (তাঁর অনেক গল্প-উপন্যাস পোলাণ্ডে, পূর্বজার্মানিতে ও রাশিয়ায় ছবি হয়েছে), লেখেন দার্শনিক প্রবন্ধ, আমাদের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক জীবনে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা, তিনি লেখেন সাহিত্য-সমালোচনা (তাঁর একটা চমকপ্রদ বই হ'লো ‘নিখুঁত শূন্য’, সেখানে যে-সব বই আজও লেখা হয়নি, তার সমালোচনা ছাপা হয়েছে—এই যুক্তিতে যে যে-সব মানুষ কোথাও জন্মায়নি, তাদের নিয়ে যদি কাল্পনিক কাহিনী ফাঁদা যায়, তবে যে-সব বই লেখা হয়নি তাদের নিয়েও কাল্পনিক তর্ক উত্থাপন করা যায় নিশ্চয়ই), তিনি লেখেন জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দর্ভ—আর একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিশেবে ব্যবহার করেন সাইবারনেটিক দৃষ্টিকোণ।

কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর লেখক হিশেবে বিভিন্ন রূপকল্পে তাঁর অনায়াসনিপুণ অধিকার ও সহজ দক্ষতা পাঠককে তাক লাগিয়ে দেয়। প্রধানত তিন ধরনের বই লেখেন তিনি: ১. বাস্তবমুখিন কল্পবিজ্ঞানকাহিনী (সোর ১৯৬১, তারা থেকে ফেরা ১৯৬১, অপরাজেয় ১৯৬৪, নভোযাত্রী পিরুক্সের কাহিনী ১৯৭৩ ইত্যাদি) ; ২. রঙ্গকৌতুকেভরা কল্পবিজ্ঞানকাহিনী (ইয়ান-টিহির তারায়-তারায় ভ্রমণপঞ্জি ১৯৭১, ভবিষ্যতাত্ত্বিকদের অধিবেশন ১৯৭৬, রোবোটদের রূপকথা ১৯৬৪, স্নানের টবে পাওয়া পাণ্ডুলিপি ১৯৬১, পৃথিবী কী ক'রে বাঁচলো ১৯৬৫, সম্ভাবনার ড্রাগন ১৯৬৫ ইত্যাদি—এই শেষোক্ত বই দুটির নায়ক ট্রুর্ল আর ক্লাপাউৎসিউশকে নিয়ে সম্প্রতি পোলাণ্ডে একটি চমৎকার অপেরা রচিত হয়েছে) ; ৩. দর্শন ও তত্ত্ব-আলোচনা (দ্বিরালাপ ১৯৭২, কাকতালের দর্শন ১৯৬৮, কল্পবিজ্ঞানকাহিনী ও ভবিষ্যতত্ত্ব ১৯৭১ ইত্যাদি)। লেম এমনই সচেতন লেখক যে কোনো বই একবার লেখা হ'য়ে গেলেই আহ্লাদে ডগমগ ক'রে ওঠেন না, বিভিন্ন সংস্করণে অনবরত সেগুলোর সংস্কার বা পরিমার্জনা করেন. অথবা কোনো-কোনো কাহিনী-পর্যায়ে যোগ করেন নতুন-নতুন গল্প (যেমন পিরুক্স বা টিহিকে নিয়ে ফাঁদা গল্পগুলো, অথবা ট্রুর্ল ও ক্লাপাউৎসিউশের সাইবারনেটিক জগতের ফ্যাণ্টাসিগুলো।) কিন্তু তা ছাড়াও তাঁর ভিন্ন-ভিন্ন রচনা নানা দিক দিয়ে

একটা আরেকটার সঙ্গে জড়ানো—প্রসঙ্গ বা বিষয়বস্তু, পরিস্থিতি, এমনকী কোনো বাহিনীর বিন্যাস অব্দি ঘুরে-ঘুরে আসে—অথচ সেইসঙ্গে আবার বদ্‌লেও যায়, তার কারণ বিভিন্ন রূপকল্পে ও রচনারীতিতে তাঁর এমন অসামান্য অধিকার। অন্তত এই বইতে যে-দুটি ছোটো উপন্যাস একসঙ্গে প্রকাশ করা হ'লো ('পোলোভানিয়ে' অর্থাৎ 'মৃগয়া'—এটি বেরিয়েছিলো ভার্শাভায় ১৯৭৩-এ, 'ওপোভিয়েশ্চি ও পিলোচিয়ে পিরুক্সি'তে, আর 'মাস্কা' বা 'মুখোশ' বেরিয়েছিলো ক্রাকুভ-এ, ১৯৭৬-এ, ঐ নামেরই ছোট্ট বইতে) সে-দুটি যে পরস্পর-সম্পৃক্ত, সে-দুটি যে একই কাহিনীর রকমফের, সেটা নিশ্চয়ই বিশদ ক'রে বলার প্রয়োজন নেই, অথচ পাঠক লক্ষ করবেন তাদের অভিঘাত সম্পূর্ণ ভিন্ন, দু-রকম। 'দ্বিরালাপ' বইতে তিনি খুব সাবধানে, সজাগ যুক্তি সাজিয়ে, দেখিয়েছেন তাত্ত্বিক দিক থেকে একজন মানুষের অনেকগুলো সংস্করণ করা সম্ভব, পরমাণুর পর পরমাণু সাজিয়ে হয়তো গ'ড়ে তোলা যায় অনেকগুলো একই মানুষ—কিন্তু তাদের চৈতন্য—বা চেতনাপ্রবাহ—কখনও একরকম হবে না, কেননা চেতনা—সে কোনো জড়পদার্থ নয়, বরং সে এক সজীব, প্রবহমান, জটিল বিন্যাস, একটি সচল ও পরিবর্তমান প্রক্রিয়া, এমন-একটি সাইবারনেটিক পদ্ধতি যাকে এখনও স্পষ্ট শনাক্ত ক'রে ফেলা যায়নি—অর্থাৎ তাকে এখনও গণিতের কোনো ফর্মুলায় বেঁধে ফেলা যায়নি: যেহেতু সে আসলে অনির্দেশ্য ও অপরিকল্পিতপূর্ব তাই আগে থেকেই তার সাত কাহন ব'লে দেয়া যায় না। যদি কোনো প্রকৌশল থাকে আমাদের হাতে, কোনো মগজের যে অনেকগুলো প্রতিলিপি তৈরি ক'রে দিতে পারে, সেই ভিন্ন-ভিন্ন 'একই' মগজের যদি একই স্মৃতি থাকে, তার দখলে যদি থাকে একই তথ্যের ভাঁড়ার, একই অস্মিতার ধাত, একই ব্যক্তিত্ব, এই নতুন মগজ তবু হ'য়ে উঠবে এক 'ভিন্ন আমি'র আধার। এই ব্যক্তিচৈতন্য, এই অনুভূতিপ্রবণ সংবেদী, এই ব্যক্তিরূপই (পোল ভাষায় লেম ব্যবহার করেন ওসোবোভোশ্চ্ শব্দটি) এই বিশ্বে তাহ'লে একমাত্র বস্তু যার কোনো পুনরাবৃত্তি হয় না—একবার সে হারিয়ে গেলে দ্বিতীয়বার আর তাকে ফিরে পাওয়া যায় না। অথচ ব্যাপারটা আরো বিপন্ন—কেননা তাকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হয় শারীরিক ছকেরই ওপর, যেটা তাকে (মগজ, জৈবরূপ) ধ'রে রাখে, ফলে কত সহজেই এই অদ্বিতীয়কে খতম করা যায়। এই বিশাল, উদাসীন,

এলোমেলো বিশ্বে ওসোবোভোশ্চ্‌ তাই ভঙ্গুর, পলকা, ক্ষণজীবী এক অদ্বিতীয়ত্ব। জীবন নয়, তাই, চৈতন্যই লেমের কাছে এত পবিত্র। যাঁরা তাই বলেন মগজ ধোলাই ক'রে সবাইকেই এক ছাঁচে ঢেলে দেয়া যায়, সবাইকে একরকম ক'রে তোলা যায়, একজন হ'য়ে ওঠে আরেকজনেরই হুবহু নকল, আদ্যোপান্ত এক অবিকল প্রতিমূর্তি – তাঁরা তাই ঠিক বলেন না। আর সেইজন্যেই কোনো চেতনযন্ত্র বা ভাবুককল কোনো চেতন মানুষের চাইতে কম অলঙ্ঘ্য বা অপবিত্র নয়, তারও আছে সমান নৈতিক অধিকার। তাকে যদি স্বয়ম্বশ চৈতন্য দেয়া যায়, তবে তাকে স্বাধীনতাও দিতে হবে। তাকে কোনো ছকে আটকে রাখা, তাকে কোনো বিধান বা নিদান-পঞ্জি খাইয়ে দেয়া, তাই, তাকে ক্রীতদাস ক'রে তোলবারই অন্য নাম। উদ্ভাবক তাই উদ্ভাবনকে নিজের সম্পত্তি ব'লে ভাবতে পারবে না। মানুষ তবু চায় তার সৃষ্টিকে দখলে রাখতে, বশে রাখতে। আর তাই, চেতনযন্ত্র বা ভাবুককল নয়, মানুষই লেম-এর গল্পে দানো বা রাক্ষস—আর যন্ত্রগুলোই তার নিষ্পাপ শিকার। আর এটা প্রচলিত সাহিত্যের ঐতিহ্যের একেবারেই উলটো মত।

সব দেশের সাহিত্যেই এই মজার ব্যাপারটা দেখা যায়: সেই আদিকাল থেকেই লোকে 'মানুষ, অথচ মানুষ নয়' এমন জীব অথবা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি মানুষের কথা ভেবে এসেছে, আর সাধারণত এই 'না-মানুষ'রা কেমন যেন অদ্ভুত জীব হ'য়ে থাকে—কেমন একটা গা ছমছমে ভয়ের ভাব জড়ানো থাকে তাদের সঙ্গে, থাকে একটা আতঙ্ক আর বিভীষিকার ভাব, যেন তারা সবাই দানো একেকজনে, অথবা যক্ষ-রক্ষ-কিম্পুরুষ। কিংবা হয়তো 'মানুষপিশাচ', 'নরদানব', প্রেতলোক-থেকে-ফিরে-আসা মড়া, কিন্নর, অপ্সর, গন্ধর্ব বা এই জাতীয় আরো-সব। হয়তো এদের সম্বন্ধে আমাদের একটা সহজাত বা আদিম ভয় বা আদিম ভয় বা সংস্কার থেকে গিয়েছে—অর্ধেক-মানুষ কিছুকে দেখলে আমাদের ডর লাগে; যা আদৌ মানুষী নয়, তার মধ্যে হঠাৎ যদি কোনো মানবিক বৈশিষ্ট্য দেখি, তবে হয়তো সে-ভয় মাত্রা ছাড়িয়ে যায় - অর্থাৎ জন্তুজানোয়ার, যন্ত্র, মৃত কিংবা জড় পদার্থে যদি মানুষী ভাব দেখি তবে আমরা দারুণ ঘাবড়ে যাই···

তবু, এও বলা ভালো, প্রাচীন ধ্রুপদী সাহিত্যে এদের প্রতি এতটা ভয় আমাদের ছিলো না। রক্ষ-যক্ষ-অপ্সর মানুষের চাইতে অনেক বেশি শক্তি-

ধর: কিন্তু তারা অপমানব বা উনমানব নয় হয়তো, বরং অপ-বা উপ-দেবতাই। আসলে ভয়টা বেশি ক'রে গজিয়ে উঠেছিলো পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য রোমান্টিক আন্দোলনের সঙ্গে-সঙ্গে। অর্থাৎ এদের প্রতি আমাদের বিরূপতা বা আতঙ্কের উৎস রোমান্টিক আন্দোলন—আর তার মানে, স্পষ্টতই, আদর্শগত এবং ঐতিহাসিক। অনেক দিন অব্দি, এমনকী উনিশ শতকের গোড়ার দশকগুলো জুড়ে, রোমান্টিকরা ভেবে এসেছিলো সত্য, শিব, সুন্দর, ন্যায়বিচার ও নৈতিকতা—এইসবকিছুরই মাপকাঠি প্রকৃতি এবং সম্প্রসারিত অর্থে 'স্বভাব'। 'স্বাভাবিক' অর্থাৎ 'প্রকৃতিজাত' (না কি 'প্রাকৃতিক'?) প্রায় নৈতিক বা ধার্মিকেরই প্রতিশব্দ হ'য়ে উঠেছিলো। 'স্বধর্মচ্যুত'—অর্থাৎ সহজাত প্রকৃতি/স্বভাব-চ্যুত। কাজেই যে বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির বিধান লঙ্ঘন ক'রে মানুষ বানাতে চেয়েছে, সে গ'ড়ে তুলেছে মানুষেরই কিম্ভূত বা ভয়াবহ প্যারডি, অর্থাৎ গ'ড়ে তুলেছে শিব গড়তে বাঁদর; এমন-এক জীব যার শক্তি আছে, ধূর্তবুদ্ধি আছে, কিন্তু যার আত্মা নেই, মানবিক বৃত্তি নেই (আর মানবিক বৃত্তি বলতে বোঝানো হয়েছে সবগুলো কোমল বৃত্তি - স্নেহ প্রেম প্রীতি সহানুভূতি ইত্যাদি—যেন মানুষ নিষ্ঠুর হয় না, নৃশংস হয় না, স্বার্থপর হয় না, অহংকেন্দ্রিক হয় না।) আর এই কৃত্রিম মানুষ যেহেতু বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের সৃষ্টি—আর বিজ্ঞান যেহেতু রোমান্টিকদের মনে হ'তো অশুভ বা বা অমঙ্গল, অতএব এই কৃত্রিম মানুষও নিশ্চয়ই অশুভ বা অমঙ্গল। দৃষ্টান্ত হিশেবে ধরা যাক এ. টে. আ. হোফমান্-এর 'দি স্যাণ্ডম্যান' (১৮১৬) (অফেনবাখের অপেরা 'টেল্স অভ হোফমান্' মনে আছে?) অথবা মেরি শেলী বা ডক্টর ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের 'নতুন মানুষ' (১৮১৮)। এটা মনে রাখা উচিত, ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন বিজ্ঞানী, তিনিই সৃষ্টি করেছিলেন কৃত্রিম মানুষ তিনি নিজে বিজ্ঞানের তৈরি কৃত্রিম মানুষ নন। এই ধারণাটাও তখন ছড়িয়ে পড়ছিলো যে বৈজ্ঞানিকরা - প্রমেথিউস, লুসিফার, বা ফাউস্টের মতোই—যা হওয়া উচিত নয়, তা-ই হ'য়ে উঠতে চাচ্ছে—কারণ কৃত্রিম মানুষ, তৈরি করবার চেষ্টা ক'রে তারা ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে উঠছে। ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন ভগবানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে—অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক লাগাম খুলে দিচ্ছে মানবতাবিরোধী শক্তির, দানোর। এ-রকম ধর্মবিরুদ্ধ অহমিকা তাই তার কথায় অনিবার্যভাবেই শেষে পরিণামকঠোর আঘাতের মতো নেমে আসবে…

'ঠিক সেই দেবদূতের তো, যে সর্বশক্তিমান হ'তে চেয়েছিলো, আমিও এক

চিরস্থায়ী নরকে বন্দী হ'য়ে আছি,' যেমন বলেছিলো ডক্টর ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন। এটাই ছিলো, তাহ'লে, ঐতিহ্য। এমনকী নিছক নির্দোষ শতরঞ্জ খেলবার অছিলায় মনুষ্যযন্ত্র নির্মাণ করলেও সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী, যেমন দেখিয়েছিলো অ্যামব্রোস বিয়ার্স-এর 'মক্সনের প্রভু' (১৮৯৩) দানো-সে শেকল ছাড়া হ'তেই তার স্রষ্টার বিরুদ্ধে খেপে উঠেছিলো।

কৃত্রিম মানুষ সম্বন্ধে রোমান্টিকদের এই-যে প্রচণ্ড আতঙ্কের বোধ, তার মধ্যে সম্ভবত এই ভাবনাটাও প্রচ্ছন্ন ছিলো যে মানুষের নিজের মধ্যেই কোথাও নিশ্চয়ই কোনো-মহা অশুভ ঘুমিয়ে আছে—যে-অশুভকে শুধুমাত্র আত্মাই লাগাম বেঁধে রাখতে পারে; আত্মা না-থাকলেই এই অশুভ, এই অমঙ্গল একেবারে তালমানছেঁড়া, বলগাহীন, ঝাঁপিয়ে পড়বে মানুষেরই বিরুদ্ধে। অর্থাৎ কৃত্রিম মানুষ অংশত—মানুষেরই মধ্যকার দানো বা রাক্ষসের একটা প্রক্ষেপ; মিস্টার হাইড তো আসলে ডক্টর জেকিলেরই 'বিজ্ঞানের' সৃষ্টি।

সারা উনবিংশ শতাব্দী জুড়েই 'স্বাভাবিক' মানুষ ও 'কৃত্রিম' মানুষের এই যুযুধান চিন্তাটি ক্রমশ একটা স্পষ্ট অবয়ব নিয়ে নিচ্ছিলো; ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছিলো আত্মা ও সত্তা, বদলে মানুষ হ'য়ে উঠছিলো দুর্দান্ত বস্তুবাদী, প্রকৃতির সব বিধিবিধানের দাস, যেমন ভেবেছিলেন ডারউইন; আর কোনো-কোনো লেখক বিজ্ঞানের এই পরাক্রান্ত উত্থানকেই ভাবছিলেন মানুষের মানবতারই পরিপন্থী বা বিরুদ্ধ শক্তি হিশেবে। ১৮৬৪ তে দস্তয়েভস্কির 'পাতাল থেকে লেখা টীকা' উপন্যাসের যুক্তি-ও বিজ্ঞান-বিরোধী উত্তম পুরুষ বিজ্ঞানের সৃষ্টি আধুনিক মানুষকে দেখেছিলো নিছকই আত্মা-বিরহিত যান্ত্রিকতা হিশেবে—এমন-এক যন্ত্রপ্রতিম মানুষ যার না-আছে কোনো প্রাতিস্বিকতা, না-বা কোনো স্বাধীনতা।

বিজ্ঞানকে যথেচ্ছ বাড়তে দিলে মানুষই নিজে যে যন্ত্র হ'য়ে পড়বে, এই ধারণাটাই ক্রমে জোরালো হ'য়ে উঠলো বিংশ শতাব্দীতে, তবে সেই সঙ্গে অন্য একটা ধারারও সূচনা হ'লো। দ্বিতীয় ধারাটা স্পষ্ট ক'রে এই কথাই বললে যে, বিজ্ঞান নিজে থেকে কোনো অমঙ্গল আনে না—মানবতাবিরোধী অমঙ্গলের জন্ম দেয় কোনো অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা, কোনো বিশেষ উৎপাদন পদ্ধতি, অর্থাৎ পুঁজিবাদ, পুঁজিবাদের মধ্যেই এমন-কিছু আছে যা মানুষকে অমানুষ ক'রে ফ্যালে। আজ যে অনবরত পশ্চিমের শিল্পসাহিত্যে

আমরা 'ডিহিউম্যানেজাইশনের' কথা শুনছি, গ্রেগর সামসারা যে আজ পরিণত হয় কীটে, পোকায়, অথবা নিছকই উপার্জন-উৎসুক যন্ত্রে, তার কারণ বিজ্ঞান নয়, পুঁজিবাদ। ফ্রান্‌ৎস কাফকার দিনপঞ্জির এক জায়গায় স্পষ্ট ক'রে বলা আছে: 'পুঁজিবাদ আসলে পরনির্ভরতার সম্পর্কগুলোরই একটা ব্যবস্থা, বাইরে থেকে ভেতরে, ভেতর থেকে বাইরে, উঁচু থেকে নিচে, নিচে থেকে উঁচুতে পৌঁছে যায় সে। সবকিছুই গ'ড়ে তোলা ক্রমোচ্চ ভঙ্গিতে, ধাপে-ধাপে, সবকিছুই শেকল বাঁধা [একটা আরেকটার সঙ্গে জড়ানো]। পুঁজিবাদ জগতের একটা অবস্থা, আর আত্মারও। …আমরা যেন কোনো বস্তু হ'য়ে উঠছি, জীবন্ত অস্তিত্ব নয়, নিছক জড়বস্তুই যেন-বা।' অর্থাৎ বিজ্ঞান নিজে থেকে মনুষ্যত্ব-বিরোধী কিছুই করে না—মানুষকে অমানুষ ক'রে তোলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই। 'এক্সপ্রেশনিস্ট' শিল্পে ও নাট্যে এই কথাটাই বোঝানো হচ্ছিলো: গেয়র্গ কায়সারের 'গ্যাস' ত্রিখণ্ড, অথবা এমনকী রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী', যতটা না বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে, তার চেয়েও বেশি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে—অর্থাৎ পুঁজিবাদের চৌহদ্দির মধ্যে বিজ্ঞানের প্রয়োগের বিরুদ্ধে।

পুঁজিবাদের দমবন্ধ কাঠামোর মধ্যে বিজ্ঞানের যে-প্রয়োগ, তার বিরুদ্ধে অনেক লেখকই কলম ধরেছেন, কেননা এই পরিবেশে বিজ্ঞানকে তাঁদের শুধু-যে মনুষ্যত্বের পরিপন্থী ব'লে মনে হয়েছে, তা-ই নয়, মনে হয়েছে অমানবিক ক'রে তোলবারও পদ্ধতিও যে-মানুষের সবকিছু জানা হ'য়ে গেছে, লেখাজোখা হ'য়ে গেছে, যার সবকিছুই বাইরে থেকে এদিক-ওদিক যথেষ্ট মোচড়ানো যায়, যে আর মানুষই থাকবে না। চেখ লেখক কারেল চাপেকের মধ্যে পুঁজিবাদ ও বিজ্ঞানের এই সম্পর্ক স্পষ্ট ধরা পড়েছিলো: বিজ্ঞানের সৃষ্টি কৃত্রিম বা রচিত মানুষ আর পুঁজিবাদ ও প্রকৌশলের অঙ্গুলিহেলনে মানুষেরই 'কৃত্রিম' হ'য়ে যাওয়া—এই বিষয় নিয়ে ১৯২১-এ বেরিয়েছিলো তাঁর নাটক 'আর. ইউ. আর.' ('রোসুমের বিশ্বজনীন রোবোটরা')। চাপেকের মনে হয়েছিলো 'মার্কিন' প্রকৌশল ও পুঁজিবাদ এবং বিস্তীর্ণ ও বহুব্যাপী একমাত্রিক নাগরিক সমাজ—দুইই ব্যক্তির প্রাতিস্বিকতা, স্বাধীনতা ও মানবতার পক্ষে ক্ষতিকর। রোসুম হ'লো গবেষণাগারে গ'ড়ে-তোলা কৃত্রিম মানুষের স্রষ্টা (রোজুম চেখ ভাষায় বোঝায় যুক্তি, বিশ্লেষণক্ষমতা, আর রোবোট কথাটা এসেছে রোবোটা থেকে, যার মানে

কায়িক শ্রম, 'দাসশ্রম')। রোসুম প্রায় যেন আজকের দিনেরই কোনো ডক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন, 'সে চেয়েছিলো ঈশ্বরেরই কোনো বিজ্ঞানসৃষ্ট বিকল্প হ'তে'। তার ছেলে, তরুণ রোসুম, সে তারই উত্তরাধিকারী – ব্যাবহারিক বিজ্ঞানী, ব্যাবসাদার, শস্তা শ্রম জোগাবার জন্যে সে পালে পালে রোবোট তৈরি করছে, কারখানার উৎপাদনকে ক্রমশ সহজ, ছিমছাম ও নিপুণ ক'রে তুলছে। পুঁজিবাদের মারাত্মক যুক্তিশৃঙ্খলা এই রচিত-মানুষদের বাহিনীকে প্রায় আক্ষরিকভাবেই এক সেনাবাহিনীতে পরিণত ক'রে তুলছে, যারা অচিরেই মানবজাতিকে ধ্বংস ক'রে ফেলবে। চাপেকে রোবোট একই সঙ্গে দু-রকম: মানুষের আত্মহত্যার যন্ত্র, আবার প্রাতিস্বিকতাবিহীন মানুষের প্রতীক।

লেম অনেকটাই অন্য কথা বলেন। স্মৃতি, তথ্য, শিল্প – এইসব প্রত্যেকের চৈতন্যকে স্বতন্ত্র ক'রে তোলে, এমনকী রোবোটেরও। 'সোলারিস' চলচ্চিত্রে, নিশ্চয়ই মনে আছে, কোনো সভ্য বা চেতন মানুষের স্মৃতির উত্তরাধিকার হিশেবে ব্যবহার করা হয়েছিলো – অন্য অনেককিছুর সঙ্গে-সঙ্গে—সেরভানতেসের 'দোন কিহোতি,' পেটার ব্রয়গেলের ছবি, য়োহান সেবাস্টিয়ান বাখ্-এর 'এফ মাইনরে রচিত প্রোলোগ'—; 'মুখোশ' গল্পে রাজনৈতিক বিরোধী নেতা আরহোডেসকে মারবার জন্যে যে-মারণকল, যে-রূপসী তরুণীযন্ত্র সৃষ্টি করা হয়েছিলো (এ. টে. আ. হোফমানের ঠিক উলটো) তার মধ্যে ধ'রে দেয়া হয়েছিলো আন্জেলিতা, ট্রলেনিক্স, ডুয়েন্না, ডিউকদুহিতার স্মৃতি। কিন্তু এই রূপসী মারণকলের চৈতন্য (এই স্মৃতি আছে ব'লেই—তবে এই স্মৃতি তো তার ছাড়াও আরো অনেকেরই ছিলো) পরিস্থিতিতে সাড়া দিয়েছিলো একেবারেই অভাবিতপূর্বভাবে। অচেনা ও না-মানুষ এই যন্ত্র, অথচ তার লক্ষ্য মানবতা অর্জন, মনুষ্যত্ব অর্জন—সেটার তার গন্তব্য। গ্রহান্তরের জীব অথবা ভাবুকযন্ত্রের চিন্তার জগতে প্রবিষ্ট হ'য়ে আমরা আবিষ্কার করি লেম আমাদের সামনে মানুষরই রহস্য উন্মোচন করছেন: 'মুখোশ' গল্পের 'নিদানক্রমের' ফাঁদ তাই হ'য়ে ওঠে আমাদেরই অস্তিত্বের ফাঁদ বা বেড়াজাল: রাজার অনুজ্ঞায় তৈরি এই যন্ত্র আমাদেরই মতো প্রেম, সংরাগ, অনুভূতির তাড়া আর পরিস্থিতির বলি। 'মুখোশ'-এর এই আশ্চর্য নায়িকা একই সঙ্গে মানুষ আর না-মানুষ (পোল 'মাস্কা' কথার মানে 'মুখোশ,' আবার 'মাশ্কারা' কথার মানে দানো—ইংরেজি 'মাস্ক' কথাটিও লাতিন ভুত বা ডাইনি থেকে এসেছে)। সে যদি

একই সঙ্গে মানুষ ও দানো, শিকারী ও শিকার না-হ'তো, তবে গল্পটি এমন জোরালো, এমন যথাযথ, এমন সত্য হ'য়ে উঠতো না। সে মানুষ হ'য়ে উঠলো দ্বিধায়, দোলাচলে, সন্দেহে, অনিশ্চয়তায়।

লেমের উদ্ভাবনীনৈপুণ্য তাকলাগানো, কিন্তু গল্প সাজাবার কৌশলগুলো সরল—অথচ টান-টান, রুদ্ধশ্বাস। একটা রহস্য বা গা ছমছমে পরিস্থিতি তৈরি করা হ'লো, কী সেই রহস্য বোঝাবার জন্যে দেয়া হ'লো অনেকগুলো জল্পনা, সম্ভাবনা, তারপর শ্বাসরোধী রোমাঞ্চকর পরিস্থিতিতে নায়ক তার সমাধান করতে গিয়ে ধাঁধা বা হেঁয়ালিটির একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ালো। কিন্তু তবু সন্দেহ, দ্বিধা, দোলাচল থেকেই যায়—পির্‌ক্স জানে না বিকল রোবোটটি তার প্রাণ ইচ্ছে ক'রে বাঁচিয়েছিলো কি না; রূপসী তরুণীযন্ত্রটি জানে না আর্‌হোডেস যতক্ষণ বেঁচে থাকবে ততক্ষণ তার মধ্যে খুনের ঐ তাড়না থাকবে কি না। সমাপ্তিটি খোলামেলা; অদ্ভুত চেনা লাগে আমাদের, আবার অচেনাও, আর সারাক্ষণ থাকে গা ছমছমে একটি অনির্দেশ্য আবছায়া।

আর সেইজন্যেই লেম-এর লেখায় মুখোশ, মুকুর বা প্রতিবিম্বের এত ছড়াছড়ি। অচেনার আড়ালে চেনা, চেনা জিনিশকে অচেনা ক'রে দেখানো, বেরটোল্ট ব্রেখ্‌ট যাকে বলেন 'এলিয়েনেশন' পদ্ধতি, লেম তাকে দুর্ধর্ষ নৈপুণ্যের সঙ্গে কাজে খাটান। আয়না হয়তো অনেক সময় মিথ্যে কথা বলে, মুখশ্রীর চাইতে মুখোশই হয়তো অনেক সময় বেশি সত্য। আর লেম এটা করেন একই বিষয়কে নানা কোণ থেকে দেখিয়ে: 'মৃগয়া'য় মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে রোবোটকে, আর 'মুখোশ'-এ রোবোট খুঁজে বেড়াচ্ছে মানুষকে—যেহেতু তার মধ্যে এই মর্মেই নিদানক্রম পুরে দেয়া হয়েছে। একটা গল্প আরেকটার প্রতিবিম্ব, আবার তা নয়ও। আর সেইজন্যই স্তানিসোয়াভ লেম-এর সব লেখাই এমন নতুন, উত্তেজনা জাগানো, আবার কেমন যেন চেনা।

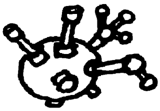

মৃগয়া

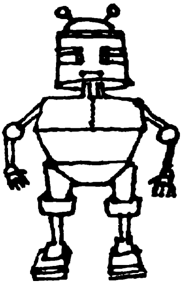

বন্দর-নিয়ন্ত্রণ দপ্তর থেকে সে বেরিয়ে এলো খেপে, দাপাতে-দাপাতে। ঝামেলাটা কিনা তার বেলাতেই ঘটলো, তারই বেলায়। জাহাজে পাঠাবার মতো মাল নেই মালিকের কাছে : আর নেই মানে নেই, ব্যস, দাঁড়ি, পূর্ণচ্ছেদ। সত্যি-যে টেলিগ্রাম এসেছিলো একটা : '৭২ ঘণ্টা অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব—কড়ার অনুযায়ী সব জরিমানা আপনার নামে জমা ক'রে দেয়া হয়েছে—এনস্ট্র্যাণ্ড।' বাণিজ্যউপদেষ্টার দপ্তরে গিয়েও তার কোনো লাভ হ'লো না। বন্দরে দারুণ ভিড় আর কাজের চাপ; শর্ত অনুযায়ী জরিমানা পেলেও বন্দর-নিয়ন্ত্রণ মোটেই খুশি হয়নি। মানলুম যে আপনার মহাকাশযান এখানে থামিয়ে রাখার জন্য দস্তুরি দিয়েছেন আপনি, মাল বোঝাই করতে দেরি করার জন্য খেশারতও দিয়েছেন, কিন্তু, আপনিই বলুন, সময়মতো বেরিয়ে পড়লেই কি সবদিক থেকেই ভালো হ'তো না? অথবা : ইনজিনটা বন্ধ ক'রে দিন; তাতে জ্বালানির জন্য মিছেমিছি বাজে-খরচ হবে না, তিন দিন চুপচাপ ব'সে থেকে তারপর না-হয় আবার এলেন এখানে। তাতে এমন-কী অসুবিধে হবে আপনার? তিন দিন ধ'রে চাঁদকে ঘিরে ঘোরো, কারণ মালিক তোমাকে পথে বসিয়েছে! এ-কথার যে কী-উত্তর দেবে, পিরুক্স তা ভেবে উঠতে পারেনি। আর তারপরেই রাষ্ট্রপুঞ্জের চুক্তিটার কথা তার মনে প'ড়ে গেলো। মহাশূন্যে খামকা প্রকট থেকে বিপদে পড়ার আশঙ্কা সম্বন্ধে শ্রমিক ইউনিয়ন যে-আইনটা রচনা করেছে, সে যেই তার কথা উল্লেখ করলে, তারা একটু

পেছিয়ে গিয়ে আমতা-আমতা শুরু করলো। সত্যি-বলতে, সূর্য এ-বছর মোটেই শান্ত নেই। তেজস্ক্রিয়তার স্তর মোটেই অবহেলা করার মতো নয়। কাজেই তাকে বিস্তর কলকৌশল ক'রে চাঁদের আড়ালে থাকতে হবে, সবসময় সজাগ থেকে লুকোচুরি খেলতে হবে, যাতে সূর্য তাকে কোনো মোক্ষম থাপ্পড় কষাতে না-পারে; আর তার সব খরচ বহন করবে কে? মালিক নিশ্চয়ই নয়। তবে কে? বন্দর-নিয়ন্ত্রণ? আপনাদের কি কোনো ধারণা আছে, দশ মিনিট পুরোদমে সাত কোটি কিলোওয়াটের কোনো পারমাণবিক শক্তি-উৎপাদককে জ্বালিয়ে রাখতে কত খরচ পড়ে?! অনেক হম্বিতম্বির পর শেষটায় সে থাকার অনুমতি পেলে: তবে বাহাত্তর ঘণ্টা; আর সেই হতচ্ছাড়া মাল বোঝাই করার জন্য বাড়তি আর চার ঘণ্টা—তার চেয়ে এক মিনিটও বেশি নয়! যেন তাকে তারা দয়া দেখাচ্ছে। যেন সবটাই তার দোষ। আর সে কি না একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় এসে পৌঁছেছিলো, আর মঙ্গলগ্রহ থেকে সোজাসুজি আসেওনি, অথচ মালিক কি না এমনিভাবে তাকে একেবারে পথে বসাবার ব্যবস্থা…

এই কথা-কাটাকাটি আর বাগবিতণ্ডায় সে ভুলেই গিয়েছিলো কোথায় আছে। বেরুবার পথে দরজার হাতল ধ'রে এত জোরে চাপ দিয়েছিলো যে একেবারে কড়িকাঠে লাফিয়ে উঠেছিলো। লজ্জা পেয়ে সে চারপাশে তাকালে একবার, কিন্তু আশেপাশে কেউ ছিলো না। সারা লুনাকেই কেমন ফাঁকা দেখাচ্ছে। সত্যি-যে, বড়ো কাজটা চলেছে উত্তরে, কয়েকশো কিলোমিটার দূরে, হাইপাটিয়া আর টোরিসেল্লির মাঝখানে। ইনজিনিয়ার আর প্রয়োগবিদ্‌রা সবাই একমাস আগেও এখানে ছিলো, যে-কোনোখানে গেলেই কারু-না-কারু দেখা পাওয়া যেতো; এখন তারা সবাই নির্মাণস্থলে চ'লে গিয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের এই এক মস্ত প্রকল্প, লুনা ২, পৃথিবী থেকে ক্রমেই আরো বেশি লোক আনাচ্ছে। 'এবার অন্তত একটা ঘর পেতে কোনো ঝামেলায় পড়তে হবে না,' সে ভাবলে। এস্কালেটরে চ'ড়ে বসলো সে—এই পাতালনগরীর সবচেয়ে নিচের তলায় যাবে ব'লে। ফ্লুওরোসেন্ট বাতিগুলো হিমঠাণ্ডা দিবালোক ছড়াচ্ছে। প্রতি সেকেণ্ডে একটা ক'রে নিভে যাচ্ছে। খরচ বাঁচাচ্ছে। একটা কাচের দরজা ঠেলে সে একটা ছোট্ট লবিতে ঢুকলো। হ্যাঁ, ঘর ফাঁকা আছে। যত চাই পাবেন।

সে ছোকরা ভৃত্যটিকে তার স্যুটকেসটা রাখতে দিলে—স্যুটকেস না-ব'লে একটা ঝোলা বলাই ভালো, আর ভাববার চেষ্টা করলে টিনডাল মিস্ত্রিদের মাঝখানের মুখনলটা ঠিকঠাক ক'রে বসাবার কথা বুঝিয়ে বলেছে কি না। সেই মঙ্গলগ্রহ থেকেই নলটা মধ্যযুগের কামানের মতো বদ ব্যবহার ক'রে যাচ্ছে। নিজে গিয়েই সব তদারক করা উচিত তার—মালিকের দৃষ্টিকোণ ইত্যাদি···কিন্তু আবার লিফ্‌টে চ'ড়ে বারো তলা উঠতে তার ইচ্ছে করলো না, আর তাছাড়া এতক্ষণে তারা সবাই নিশ্চয়ই চ'লে গিয়েছে। সম্ভবত বিমানবন্দরের রেস্তোরাঁয় ব'সে আনকোরা সব রেকর্ড শুনছে এখন। কোথায় চলেছে খেয়াল না-ক'রেই সে হাঁটলো; হোটেলের রেস্তোরাঁটা ফাঁকা, যেন বন্ধ এখন—কিন্তু লাঞ্চ কাউন্টারের পেছনে ব'সে আছে এক লালচুলো তরুণী, কী-একটা বইয়ে মন বসানো। না কি বইটা খুলে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছে? কারণ মার্বেলের কাউন্টারের ওপর তার সিগারেটটা ক্রমেই জ্বলন্ত ছাইয়ের সরু গোল একটা রেখায় পরিণত হ'য়ে যাচ্ছে··· পিরক্স একটা চেয়ারে ব'সে পড়লো, স্থানীয় সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিলে তার কব্জিঘড়ি, আর হঠাৎ খেয়াল হ'লো বেশ দেরি হ'য়ে গেছে: রাত দশটা এখন। আর তার মহাকাশযানে—এই কিছুক্ষণ আগেই—ছিলো বেলা দুপুর। সময়ের মধ্যে এই-যে হঠাৎ-হঠাৎ লাফঝাঁপ, এই-যে চিরন্তন ঘূর্ণি আর চক্কর, সেই যখন সে উড়তে শিখছিলো, তখন যেমন ছিলো এখনও হুবহু তাই—তেমনি সমান ক্লান্তিকর। মধ্যাহ্নভোজটা রূপান্তরিত হ'য়ে গেলো নৈশ-ভোজে: লেমোনেড দিয়ে কোনোরকমে গলার নালীতে খাবারগুলো ধুয়ে ফেললে সে—আর লেমোনেড ঠেকলো সুপের চেয়েও গরম। ওয়েটার—মুখটা কেমন ঝোলাগোছের, আর কেমন পাগলাটেগোছের ঘুম-ঘুম ভাব চোখে—বিলটা ভুল যোগ করলো, না, তার তাতে সুবিধে হয়নি, যার মানে গতিক সুবিধের নয়; পিরক্স তাকে পরামর্শ দিলে ছুটি নিয়ে কিছু-দিনের জন্য পৃথিবীতে ফিরে যেতে, তারপর চটপট কেটে পড়লো—যাতে কথাবার্তায় কাউন্টারের মেয়েটির ঘুম ভেঙে না-যায়। দারোয়ানের কাছ থেকে চাবি নিলে সে, তারপর নিজের ঘরের দিকে চললো। চাবির সঙ্গে লাগানো পাতটা আগে সে খেয়াল করেনি, এখন প'ড়ে দেখে একটু আশ্চর্যই হ'লো: ১৭৩ নম্বর ঘর; অনেক দিন আগে ঠিক এই ঘরটাতেই

সে ছিলো, সেই প্রথম যে-বার 'এদিকটায়' উড়ে এসেছিলো। কিন্তু দরজা খুলে সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলো যে হয় এটা অন্য-কোনো ঘর আর নয়তো এটা পুরোপুরি নতুন ক'রে বানানো ও সাজানো হয়েছে। না, তার ভুলই হয়েছে নিশ্চয়ই: অন্য ঘরটা আরো বড়ো ছিলো। বোতাম টিপে-টিপে সে সবগুলো আলো জ্বালিয়ে দিলে: অন্ধকারে থেকে থেকে বিশ্রী লাগছে, দুর্বিষহ; আয়নাটার দিকে তাকালে একবার, ছোট্ট লেখার টেবিলটার টানা খুললো, কিন্তু জিনিশপত্র খোলবার ইচ্ছে করলো না, শুধু পাজামাটা ছুঁড়ে দিলো বিছানার ওপর, আর বেসিনের কাছে রাখলো দাঁতের মাজন আর বুরুশটা। হাত ধুলো সে, জলটা যথারীতি কনকনে ঠাণ্ডা, কেন যে জ'মে যায় না এটাই আশ্চর্য। গরম জলের ছিপিটা খুললো—কয়েকটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়লো টপটপ। ফোনের কাছে গেলো সে, নিচে আপিশে ফোন করবে ব'লে, কিন্তু শেষটায় আর ফোন করতে ইচ্ছে করলো না: কী লাভ মিছেমিছি নালিশ ক'রে? কেলেঙ্কারি তো বটেই—এখানে চাঁদে সব জরুরি জিনিশই প্রচুর পরিমাণে গুদোমভর্তি, অথচ হোটেলের ঘরে একটু-খানি গরম জল পাবারও জো নেই! রেডিওটা চালিয়ে দিলে সে। সান্ধ্য খবর আওয়াজ ক'রে উঠলো: চাঁদের সব খবর। তার কানে প্রায় গেলোই না খবরগুলো; সে তখন ভাবছে মালিকের কাছে তার কোনো তার পাঠানো উচিত কি না। বলাই বাহুল্য, প্রাপককেই খরচাটা দিতে হবে। কিন্তু না, কোনো লাভ হবে না তাতে। মহাকাশ যাত্রার সেই আদ্দিকেলে রোমাঞ্চকর যুগ নেই আর এটা! সে-যুগ কবেই কেটে গিয়েছে, এখন কেউ নিছকই একজন পরিচালক মাত্র, আর মহাকাশযানে যারা মাল পাঠায় তাদের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল! মাল, বিমা, খেশারত…রেডিও কী যেন বিড়বিড় করছে। ইশ, কী বলছে…সে বিছানা থেকে হেলে রেডিওটার নব ঘোরালে।

—'সম্ভবত লেওনিড পুঞ্জের এটাই শেষ ধাক্কা,' সংবাদদাতার মোলায়েম উদাত্ত কণ্ঠস্বরে ঘরটা গমগম ক'রে উঠলো। 'কেবল একটা বহুতল অট্টালিকা সরাসরি চোট খেয়েছে আর তার নিশ্ছিদ্র আবরণটা হারিয়েছে। যদিও কাকতাল, তবু ভাগ্যিশ বাসিন্দারা সবাই কাজে বেরিয়েছিলো। বাকি উল্কাখণ্ডগুলো খুব-একটা ক্ষতি করেনি—গুদোমঘরের বর্ম ভেঙে-

‘শুধু একটা উল্কাই আছড়ে পড়েছিলো। আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে, নির্মাণস্থলের জন্য যে-ছটি স্বয়ংক্রিয় রোবোট বানানো হয়েছিলো, সেগুলো সব কটাই সম্পূর্ণ ধ্বংস হ'য়ে গেছে। উঁচু প্রেষওলা বিজলী তারগুলোরও ক্ষতি হয়েছে; টেলিফোনের লাইনও ভেঙে গিয়েছিলো, তবে তিন ঘণ্টার মধ্যেই তা মেরামত করা হয়েছে। বিশেষ-বিশেষ খবরগুলো আবার বলছি। আজকে সকালে নিখিল আফ্রিকা অধিবেশনে…’

রেডিওটা বন্ধ ক'রে দিলে সে! তারপর উঠে বসলো বিছানায়। উল্কাপাত? একটা পুঞ্জ? হ্যাঁ, ঠিক লেওনিড পুঞ্জের কাছ থেকে একটা অতর্কিত ধাক্কা আসার কথা ছিলো: কিন্তু ওই-সব পূর্বাভাস—আবহাওয়া দপ্তর সবসময়েই ঝামেলা পাকাচ্ছে, ঠিক পৃথিবীর আবহাওয়া দপ্তরের সব পর্যবেক্ষণের মতোই একই রকম অকেজো…নির্মাণস্থলের কাছে? তার মানে উত্তরের ওই কনস্ট্রাকশন সাইটটা। তবু সব সত্ত্বেও বায়ুমণ্ডল হচ্ছে বায়ুমণ্ডল, আবহাওয়া হচ্ছে আবহাওয়া, আর এখানে তার অনুপস্থিতি, সত্যি, দারুণ ঝামেলা পাকানো। ছটা রোবোট—হুম! তবে এটা ভালো খবর যে, কেউ জখম হয়নি। যদিও জঘন্য কদর্য ব্যাপার—একটা বর্ম ফুটো হ'য়ে গেছে! হ্যাঁ, ডিজাইনটা যে বানিয়েছিলো, তার উচিত ছিলো…

দারুণ অবসন্ন সে। সময়, সত্যি, দারুণ তালগোল পাকিয়ে গেছে: তাকে একেবারে জব্দ ক'রে দিয়েছে। মঙ্গলগ্রহ থেকে পৃথিবীর রাস্তায় নিশ্চয়ই একটা মঙ্গলবার খুইয়ে বসেছে তারা। সোমবারের পরেই হঠাৎ এসে হাজির বুধবার; তার মানে একটা আস্ত রাত্তিরও তারা হারিয়েছে। ‘আমার বরং একটু ঘুম জমিয়ে নেয়া উচিত,’ ভাবলে সে, তারপর উঠে পড়লো—স্বয়ংচল কলের মতো খুদে বাথরুমটার দিকে যেতে গিয়ে বরফহিম জলের কথা মনে পড়তেই সে শিউরে উঠলো, তক্ষুনি ঘুরে দাঁড়িয়ে চটপট ফিরে এলো বিছানায়। তার মহাকাশযানের বাঙ্কের কাছে এই বিছানাটা কোথাও লাগে না। আপনা থেকেই তার হাত চ'লে গেলো বেল্টের খোঁজে, চাদরটার ওপর বাঁধবে ব'লে, তারপর বেল্টটার কোনো হদিশ না-পেতে এক চিলতে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে; সে তো আছে

এক হোটেলে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকস্মিক বিলোপের কোনো ভয়ই এখানে নেই···ওটাই ছিলো তার মগজে শেষ ভাবনা। যখন চোখ খুললো, প্রথমটায় ভেবেই পেলে না কোথায় আছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারপাশে। 'টিনডাল!' ব'লে চেঁচিয়ে উঠতে চাইলো সে. আর তক্ষুনি—প্রতীয়মান কোনো কারণ ছাড়াই—তার মনে প'ড়ে গেলো কেমন ক'রে টিনডাল একবার কামরা থেকে আতঙ্কিত ছিটকে বেরিয়েছিলো, আর পাহারাকে মরিয়ার মতো চেঁচিয়ে জিগেশ করেছিলো: 'ওহে! ভগবানের দোহাই! চটপট, জলদি, বলো তো আমার নাম কী?!' বেচারা একেবারে বেহেড ছিলো তখন, কাল্পনিক কোনো অপমান বা লাঞ্ছনা নিয়ে গুম হ'য়ে ব'সে আস্ত একটা রামের বোতল টেনেছিলো। এমনি জটিল গোলকধাঁধা পেরিয়ে পির্‌ক্সের চেতনা বাস্তবতায় ফিরে এলো। উঠে প'ড়ে আলো জ্বাললে সে, স্নানঘরে ঝাঁঝরির তলায় গিয়ে দাঁড়াবে এমন সময় হঠাৎ মনে প'ড়ে গেলো কনকনে ঠাণ্ডা জলের কথা, তাই প্রথমে সাবধানে একটা ছোট্ট ঝিরঝিরে ধারা খুলে দেখলো—একটু-একটু উষ্ণ; দীর্ঘশ্বাস ফেললে সে, গরম জলে একটা খাশাগোছের দীর্ঘস্থায়ী স্নানের আকাঙ্ক্ষা ছিলো তার; তবু একটু পরে ধারাজল যখন তার গায়ে মুখে আছড়ে পড়ছে ঝাঁঝরি দিয়ে, সে গুনগুন ক'রে একটা সুর ভাঁজলো।

ঠিক যখন একটা ধবধবে জামা গায়ে চাপাবে, এমন সময় লাউডস্পিকারটা—ঘরে যে অমনতর কিছু আছে সেটা সে মোটেই ভাবেনি আগে—গম্ভীরভাবে গমগম ক'রে উঠলো:

'মন দিয়ে শুনুন! মন দিয়ে শুনুন! এটা একটা জরুরি ঘোষণা। যাঁদের-যাঁদের সামরিক অনুশীলনের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা সবাই এক্ষুনি বন্দর-নিয়ন্ত্রণের ৩১৮ নম্বর ঘরে গিয়ে কমোডোর-ইনজিনিয়ার আখানিয়ানের কাছে নাম পেশ করুন। আবারও বলছি আমরা। মন দিয়ে শুনুন! মন দিয়ে শুনুন!···' পির্‌ক্স এমনই আশ্চর্য হ'য়ে গিয়েছিলো যে একটুক্ষণ সে শুধু মোজা আর শার্ট পরা অবস্থায় হতভম্ব দাঁড়িয়ে রইলো। কী ব্যাপার? এপ্রিল ফুল নাকি? সামরিক অনুশীলনের অভিজ্ঞতা? কী

জানি, হয়তো সে এখনও ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু যখন শার্টটা টেনে খুলতে যাবে, তার হাত হঠাৎ টেবিলের কানায় ঘা খেলে, আর তার বুকের ধুকপুকি কেমন হুড়মুড় হ'য়ে উঠলো! না, স্বপ্ন নয়। তাহ'লে কী? কোনো আকস্মিক আক্রমণ? মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দারা চাঁদ দখল করবার জন্য এসে হাজির হয়েছে? কী বাজে কথা! কিন্তু সে যাই হোক না, তাকে তো যেতেই হবে···

ট্রাউজারের মধ্যে লাফিয়ে ঢুকতে-ঢুকতে কার ফিশফিশ কথা তার মগজে ঘুরপাক খেলো: 'হ্যাঁ, তুমি যেহেতু এখানে আছো, তাই এ-রকম কিছু-একটা ঘটলো। তোমার কপালটাই এ-রকম—তুমিই সব ঝঞ্ঝাট সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হও!'···ঘর থেকে যখন সে বেরিয়ে এলো, তার ঘড়ি তাকে জানালে বেলা তখন আটটা। কোথাও এক জায়গায় নেমে ব্যাপার কী জিগেশ করবে ভাবলে সে, কিন্তু বারান্দায় কেউ নেই, একেবারে ফাঁকা···লিফ্‌টও তাই, আর এস্কালেটরও, যেন এর মধ্যেই সবাই যুদ্ধের জন্য তৈরি হ'য়ে ভগবান-জানেন-কোথায়-কোন-চুলোয় একেবারে অকুস্থলে চ'লে যাবার জন্য হুড়োহুড়ি করছে···সিঁড়ির ধাপগুলো লাফিয়ে পেরুলো সে; যদিও এস্কালেটর তাড়াতাড়িই উঠছিলো, তবু সে তাড়া করলে, যেন বেপরোয়া ডাকাবুকো কাজের সুযোগটা একটু হ'লেই সে হারিয়ে বসবে···ওপরে উঠে এসে দেখতে পেলে ঝলমল আলোজ্বলা ছোট্ট একটা কিওস্ক, খবরকাগজে বোঝাই, কী ব্যাপার জিগেশ করবে ভেবে জানলায় এসে দ্যাখে ঘরটা ফাঁকা, কেউ কোথাও নেই। বেসাতি যন্ত্রে পয়সা ঢুকিয়ে কাগজ কিনতে হয়। এক প্যাকেট সিগারেট আর একটা দৈনিক কাগজ কিনলো সে, তার চলার বেগ না-থামিয়েই চোখ বোলালো সে কাগজের ওপর, শিরোনামাগুলোয়; উল্কাপাতের দুর্বিপাকের বিবরণ ছাড়া আর-কোনো জরুরি খবরই নেই তাতে। তাহ'লে এটাই কি কারণ? কিন্তু সামরিক অনুশীলনের অভিজ্ঞতা চাই কেন তার জন্য? না, কোনো মানে হয় না! লম্বা বারান্দাটা পেরিয়ে সে বন্দর-নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের দিকে এগুলো। শেষকালে লোকজন চোখে পড়লো তার। কে যেন ৩১৮ নম্বর ঘরে ঢুকছে, আরেকজন বারান্দার অন্যদিক থেকে হনহন ক'রে এদিকে আসছে।

'কিছুই নিশ্চয়ই জানতে পাবো না এখন, নিশ্চয়ই দেরি ক'রে ফেলেছি,'

ভাবলে সে ; কোটের ভাঁজটা টেনে ঠিক ক'রে সে ভেতরে ঢুকলো। ঘরটা ছোট্ট, তিনটে মাত্র জানলা ; জানলা দিয়ে দেখা গেলো জ্বলজ্বল করছে কৃত্রিম চান্দ্র স্থলদৃশ্য—তপ্ত পারদের একটা অপ্রীতিকর রং। অসমান্তরাল চৌকো ঘরটার সংকীর্ণতর দিকে দুটো ডেস্ক বসানো : আর তার সামনে পুরো ঘরটা চেয়ারে-চেয়ারে ঠাশা। স্পষ্ট বোঝা গেলো তাড়াহুড়ো ক'রে এনে ঢোকানো হয়েছে, কারণ একেকটা চেয়ার একেক রকম দেখতে, কোনোটার সঙ্গেই কোনোটার কোনো মিল নেই। চোদ্দ-পনেরোজন লোক ঘরের মধ্যে, বেশির ভাগই মাঝবয়সী, কয়েকজন শুধু ছোকরাগোছের, গায়ে নৌবাহিনীর শিক্ষানবিশের ডোরা-কাটা উর্দি চাপানো। একটু দূরে সকলের চেয়ে আলাদা ব'সে আছেন প্রৌঢ় কমোডোর—বাকি সব চেয়ারগুলো ফাঁকা। নৌবাহিনীর ছোকরাদের একজনের পাশে গিয়ে বসলো পির্ক্স, যে তাকে তক্ষুনি জানিয়ে দিলে কী ক'রে তারা ছ-জন সদ্য এই সেদিন এখানে এসে পৌঁছেছে, 'এপাশে', তাদের শিক্ষানবিশী শুরু করার জন্য, অথচ তাদের কি না দেয়া হয়েছে খুদে একটা যন্ত্র, তাকে বলা হয় মাছি, তাতে কোনোক্রমে গাদাগাদি ক'রে মাত্র তিনজন উঠতে পারে—বাকিদের তাদের পালা আসার জন্য অপেক্ষা করতে হয়, তারপর হঠাৎ কি না এই ভজকটটা এসে হাজির। আপনি কি জানেন কী ব্যাপার…? কিন্তু পির্ক্স নিজেই অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে। উপবিষ্ট অন্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝা গেলো যে তারাও সবাই এই আকস্মিক ঘোষণা শুনে হতভম্ব হ'য়ে পড়েছে—হয়তো হোটেলটা থেকেই এসেছে সবাই। নৌবাহিনীর ছোকরাটির কাছে নিজের পরিচয় দেয়া উচিত ভেবে তাকিয়ে দ্যাখে সে ব্যায়াম শুরু ক'রে দিয়েছে, আরেকটু হ'লেই চেয়ারটাই উলটে যেতো। পির্ক্স চেয়ারটার পেছন চেপে ধ'রে ডিগবাজিটা আটকালে, আর তারপরেই দরজা খুলে গেলো, ভেতরে ঢুকলো বেঁটেমতো এক লোক, কালো চুল, দু-পাশে একটু পাক ধরেছে। নিখুঁতভাবে দাড়ি কামানো, কিন্তু গালে নীলচে আভা—কড়া দাড়ির লক্ষণ, ছোট্ট আরশোলার মতো ভুরু, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, মর্মভেদী। কোনো কথা না-ব'লে চেয়ারের সারির মধ্য দিয়ে এগুলো সে, ডেস্কের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো, তারপর ভাঁজ খুলে টেনে টান-টান ক'রে দিলে 'এপাশটা'র এক মানচিত্র—১ : ১,000,000

এই মাত্রায়। হাতের পিঠ দিয়ে তার মাংসল ও তুখোড় নাকটা ঘষলো একবার, তারপর কোনো ভণিতা না-ক'রেই বললে :

'মহোদয়গণ, আমার নাম আখানিয়ান। লুনা ১ আর লুনা ২-এর সংযুক্ত কর্তৃপক্ষ আমাকে সাময়িকভাবে সেটাউরকে জব্দ ও ঘায়েল করবার জন্য নিয়োগ করেছেন।'

শ্রোতাদের মধ্যে একটা ক্ষীণ সাড়া জেগে উঠলো। কিন্তু পির্‌ক্স কিছুই বুঝতে পারলে না—সেটাউর যে কী বা কোথায়, তা-ই সে জানে না।

'আপনারা যাঁরা রেডিও শুনেছেন, তাঁরা জানেন যে,' আখানিয়ান একটা স্কেল দিয়ে হাইপাটিয়া আর আলফ্রাগানুসের মধ্যবর্তী অঞ্চলটা নির্দেশ করলে, 'এখানে গতকাল এক দঙ্গল উল্কা পড়েছিলো। বিভিন্ন উল্কাপাতের অভিঘাত ও ফল কী হয়েছে, তার বিশদ বিবরণের মধ্যে আমরা যাবো না—শুধু এইটুকু জানা দরকার যে একটা উল্কা—সবচেয়ে বড়ো উল্কাখণ্ড হ'তে পারে সেটা—ব ৭ আর র ৭-এর গুদোমের বর্মটা চুরমার ক'রে দেয়। সেটাউরগুলো ছিলো দ্বিতীয়টিতে, পৃথিবী থেকে সদ্য এসেছে, চারদিনও কেটেছে কি না সন্দেহ। রেডিওর খবরে বলা হয়েছিলো সেগুলো সব ধ্বংস হ'য়ে গেছে। কিন্তু সে-খবর, আপনাদের জানানো উচিত, ঠিক নয়।'

পির্‌ক্স এর পাশে-বসা নৌবাহিনীর ছোকরা শিক্ষানবিশটি কান লাল ক'রে শুনছিলো সব, এমনকী তার মুখটাও ছিলো একটু হা-করা, যেন প্রত্যেকটা কথাই সে না-গিলে ছাড়বে না। এদিকে আখানিয়ান ব'লে চললো :

'ছাত ধ্ব'সে প'ড়ে পাঁচটি রোবোট গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে যায়, কিন্তু ষষ্ঠটি বেঁচে যায়। আরো স্পষ্ট ক'রে বলা উচিত যে বেঁচে যায়, কিন্তু দারুণ জখম হয়। আমাদের ধারণা, এই জন্যেই ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে নিজেকে হিঁচড়ে বের ক'রে আনার পর সে কেমনতর ব্যবহার করতে শুরু ক'রে দেয়—কেমন একটু যেন…'

আখানিয়ান ঠিক যোগ্য কথাটি হাৎড়ে পেলে না, তাই বাক্যটি শেষ না-ক'রেই সে বলতে লাগলো :

'গুদোমগুলো অবস্থিত অস্থায়ী বিমানবন্দরটা থেকে পাঁচ মাইল দূরে—একটা সরু রেললাইনের সাইডিং-এর পাশে। দুর্বিপাকটার পরেই চট ক'রে একটা ত্রাণবাহিনী কাজে লেগে যায়, আর তাদের প্রথম কাজটা ছিলো সব লোকজনের হদিশ নেয়া, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা প'ড়ে কেউ মারা গেছে কি না তার খোঁজ করা। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই কাজটা চুকিয়ে ফেলা যেতো; কিন্তু ইতিমধ্যে এটা জানা যায় যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ-দপ্তরের বাড়িটার বর্ম উল্কার ঘায়ে ভেঙে গিয়েছে, অতএব কাজটা চলে মাঝরাত অব্দি। রাত একটা নাগাদ আবিষ্কার করা যায় যে পুরো নির্মাণ-স্থলের বিদ্যুৎসরবরাহের তারের জালগুলো আর টেলিফোনের লাইন-গুলো কোনোটাই উল্কাপাতের জন্য নষ্ট হয়নি। কেউ একজন তারগুলো কেটেছে—তীব্র আলোবিবর্ধক রশ্মি ফেলে।'

চমকে উঠে পিরক্স চোখ বুজলো। তার কেমন একটা অপ্রতিরোধ্য ধারণা হ'লো যে সে বোধহয় কোনো নাটকে অভিনয় করছে—কোনো মুখোশপরা নাটকে। এ-সব জিনিশ জীবনে ঘটে না! আলোবিবর্ধক রশ্মি না আর-কিছু! কেন, এই সঙ্গে মঙ্গলগ্রহের কোনো গুপ্তচরকেও যোগ ক'রে দাও না—বিশেষত যখন রোমাঞ্চ জোগাবে ব'লেই ঠিক করেছো! কিন্তু তবু এই কমোডোর-ইনজিনিয়ারকে দেখে আদৌ মনে হয় না যে নিছক ইয়ার্কি করার জন্য সে হোটেলশুদ্ধু লোকজনকে এই কাক-ভোরে এখানে টেনে আনবে।

'টেলিফোনের লাইনগুলো সারানো হয় প্রথমে,' আখানিয়ান ব'লে চললো: 'কিন্তু ঠিক সে-সময়ে ত্রাণবাহিনীর একটা ছোট্ট বেতারযন্ত্র—তারগুলো যেখানে ছিঁড়েছিলো, সেখানে পোঁছে—লুনার প্রধান দপ্তরের সঙ্গে বেতার যোগাযোগ হারিয়ে ফ্যালে। রাত তিনটের সময় আমরা জানতে পারি যে এই বেতারযন্ত্রটাও আলোবিবর্ধক রশ্মিদ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলো, আর দু-তিনবার রশ্মির ঝলক তার ওপর পড়ার পর তাতে দপ ক'রে আগুন ধ'রে যায়। চালক আর তার সহকারী মারা যায়, কিন্তু আর দুজন—ভাগ্যিশ তারা বাইরে গিয়ে লাইনটা মেরামত করবে ব'লে তখন মহাকাশচারীর পোশাক পরেছিলো—কোনোরকমে সময়মতো লাফিয়ে নেমে মরুভূমিতে গিয়ে লুকোয়—অর্থাৎ এখানে, এই মেয়ার

ট্রাঙ্কুইলাইটাটিসে আস্তানা নেয়…' স্কেল তুলে আখানিয়ান শান্ত সমুদ্রটাকে দেখালো—আরাগোর জ্বালামুখ থেকে শ-চারেক কিলোমিটার দূরে। 'দুজনের একজনও আক্রমণকারীকে চোখে দ্যাখেনি—অন্তত আমরা যদ্দুর জানতে পেরেছি। হঠাৎ তারা রশ্মির দারুণ ঝলক টের পায়, আর তক্ষুনি বেতারযন্ত্রে দপ ক'রে আগুন ধ'রে যায়। ট্যাঙ্কভর্তি গ্যাস ফেটে পড়ার আগেই তারা লাফিয়ে নামে; বায়ুমণ্ডল না-থাকাতেই বেঁচে যায় তারা, কারণ অক্সিজেনের সঙ্গে বেতারযন্ত্রের মধ্যে ট্যাঙ্কের গ্যাস যতটুকু মিশতে পেরেছিলো, আর যেখানে মিশেছিলো, শুধু সেখানেই বিস্ফোরণটা ঘটে। দুজনের মধ্যে একজন কিন্তু পরে রহস্যময়ভাবে মারা যায়—কী ভাবে, তা কেউ জানে না। অন্যজন, একশো চল্লিশ কিলোমিটার জায়গা পেরিয়ে, শেষ অব্দি মূল নির্মাণস্থলে পৌঁছুতে পারে, কিন্তু সে প্রাণের ভয়ে এমনি জোরে ছুটেছিলো যে মহাকাশচারীর পোশাকের মধ্যকার অক্সিজেন সব ফুরিয়ে ফ্যালে, আর জ্ঞান হারায়—ভাগ্যিশ তার মূর্ছিত দেহটা অন্যরা দেখতে পায়, আর তক্ষুনি তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়, এখনো সে সেখানেই আছে। কী ঘটেছে, তা শুধু তারই বিবরণ থেকে আমরা জানতে পেরেছি, এবং সব কথা ঠিক কি না, তা এখনো যাচাই ক'রে দেখা হয়নি।'

ঘরের মধ্যে অখণ্ড ও থমথমে স্তব্ধতা। বিবরণটা কোন দিকে এগুচ্ছে তা বুঝতে পির্‌ক্স-এর কোনোই অসুবিধে হয়নি, কিন্তু তবু কিছুতেই তার কাহিনীটা বিশ্বাস হচ্ছিলো না, বিশ্বাস করতেই চাচ্ছিলো না সে আসলে…

'আপনারা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছেন যে,' গলার স্বর একটুও না-চড়িয়ে বা না-নামিয়ে কালো চুলের কমোডোর-ইনজিনিয়ার ব'লে চললো, জ্বলন্ত পারদজ্বলা স্থলদৃশ্যের পটভূমিতে একপাশ থেকে তাকে দেখাচ্ছে কয়লার মতো কালো, 'নিশ্চয়ই এটা আন্দাজ করতে পেরেছেন যে, টেলিফোনের তার আর বিদ্যুৎসরবরাহের তার যে কেটেছে, সে-ই ভ্রাম্যমাণ বেতারযন্ত্রটিকে আক্রমণ করে—আর সে হ'লো এই একমাত্র বেঁচে-যাওয়া সেটাউর। এই ধরনের রোবোট সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানি না আমরা—কারণ মাত্র গতমাসে এই ডিজাইন অনুযায়ী বহুসংখ্যক রোবোট তৈরি করা শুরু হয়। সেটাউরের অন্যতম ডিজাইনকর্তা ইনজিনিয়ার

ক্লারনার আমার সঙ্গে এখানে আসবেন ব'লে ঠিক ছিলো, কথা ছিলো তিনি যে শুধু রোবোটটির ক্ষমতা সম্বন্ধে বিশদ ক'রে বলবেন, তা নয়, কেমন ক'রে তাকে অক্ষম বা ধ্বংস ক'রে ফেলা যায় তাও জানাবেন…' পির্ক্সের পাশের ছোকরা শিক্ষানবিশটি আস্তে গুমরে উঠলো। ভয়ে নয়, উত্তেজনায়, আঁৎকে ওঠার কোনো চিহ্নই নেই তাতে। পির্ক্স যে অসন্তুষ্টভাবে তাকাচ্ছে, ছোকরাটি তা খেয়ালই করলে না। কিন্তু কমোডোর-ইনজিনিয়ারের কথাগুলো মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে সবাই—অন্য কিছুতেই কারু কোনো মন নেই।

'আমি নিজে বুদ্ধিবৈদ্যুৎবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ নই, অতএব সেটাউর সম্বন্ধে আপনাদের আমি বেশি কিছু বলতে পারবো না। কিন্তু এখানে যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সম্ভবত একজন ডক্টর ম্যাকর্ক আছেন। আছেন কি?'

চশমাপরা রোগা লম্বা একজন উঠে দাঁড়ালো। 'আমিই ম্যাকর্ক। কিন্তু সেটাউরের ডিজাইনে আমার কোনোই ভূমিকা ছিলো না। আমি শুধু আমাদের ইংলণ্ডে তৈরি রোবোটের সঙ্গে পরিচিত—মারকিন ডিজাইনের সঙ্গে তার মিল আছে বটে, তবে হুবহু একরকম নয়। তবে অমিলগুলো তেমন মারাত্মক বা বড়োগোছেরও কিছু নয়। যদি আমি কিছু সাহায্য করতে পারি…'

'চমৎকার। ডক্টর ম্যাকর্ক, যদি আপনি এখানে আসেন একটু। আমি শুধু, গোড়ায়, বর্তমান অবস্থা কী, তা-ই জানাবো; সেটাউরটি এখানেই কোথাও আছে,' শান্ত সমুদ্রের ধার ঘেঁষে স্কেল দিয়ে একটা বৃত্ত আঁকলে আখানিয়ান। 'অর্থাৎ, নির্মাণস্থল থেকে তিরিশ থেকে আশি কিলোমিটার দূরে কোথাও। রোবোটটিকে এমনভাবে তৈরি করা হয়—সব সেটাউরই এইভাবে বানানো হয়েছে—যাতে অত্যন্ত কঠিন ও বিষম পরিবেশেও সে খনির মধ্যে কাজ করতে পারে—দারুণ তাপমাত্রায়. তাছাড়া খনি ধ্ব'সে প'ড়ে আটকে পড়লেও যাতে কাজ করতে পারে সেইজন্যে তার কাঠামোটা মস্ত আর পুরু বর্মে ঢাকা…কিন্তু এ-বিষয়ে ডক্টর ম্যাকর্কই আপনাদের ভালো বলতে পারবেন। তাকে অক্ষম বা অকেজো ক'রে তোলার মতো যে-উপায়গুলো আমাদের হাতে আছে তা এই: সব চান্দ্র

শিবিরের প্রধান দপ্তরগুলো আমাদের কিছু পরিমাণ বিস্ফোরক দিয়েছে, ডাইনামাইট আর অক্সিলিকুইট, তা ছাড়া হাতে চালানো যায় এমন কতগুলো আলোবিবর্ধক রশ্মি-ফেলা যন্ত্র, আর খনির মধ্যে কাজ করার জন্য তারই কতগুলো বৃহৎ সংস্করণ—বলাই বাহুল্য, বিস্ফোরক বা আলোবিবর্ধক রশ্মি-ফেলা যন্ত্র, কোনোটাই এ-রকম কোনো দ্বৈরথ সমরের জন্য তৈরি করা হয়নি। সেটাউরটিকে ধ্বংস করার জন্য যে-দলগুলো কাজ করবে, তাদের যাতায়াতের জন্য ছোটো আর মাঝারি পাল্লার যান দেয়া হবে, দুটি যানের গায়ে উল্কানিরোধ-করা হালকা বর্ম আছে। শুধু এ-রকম বর্মই এক কিলোমিটার দূর থেকে ফেলা আলোবিবর্ধক রশ্মির তেজ সইতে পারবে। সত্যি-যে, এই তথ্যগুলো পৃথিবীর, যেখানে বায়ুমণ্ডল ও আবহাওয়ার শোষণ-ক্ষমতাও একটা জরুরি উপাদান। এখানে বায়ুমণ্ডল ব'লে কিছু নেই, তাই ঐ দুটো বর্মপরা যান অন্যগুলোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত মজবুত—ততটা সহজে ধ্বংস হবে না। তাছাড়া আমরা বেশ কিছুসংখ্যক মহাকাশচারীর পোশাক ও অক্সিজেন পাবো—আর তার বেশি আর-কিছুই যে আমাদের হাতে নেই, এটা আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি। দুপুর নাগাদ সোভিয়েৎ দপ্তর থেকে তিনজনের বাহিনীর একটা "মাছি" আসবে; গাদাগাদি ক'রে তাতে হয়তো চারজন উঠতে পারেন ছোটো পাল্লার ভ্রমণের জন্য—সেটাউরটি যেখানে আছে ব'লে অনুমান সেখানে পৌঁছে দেবার জন্য। এবার আমি এই কাগজটা আপনাদের কাছে পর-পর দিয়ে যাবো, অনুরোধ করবো যাতে স্পষ্ট ক'রে তাতে আপনারা আপনাদের নাম ও দক্ষতার ক্ষেত্র লিখে দেন। ইতিমধ্যে ডক্টর ম্যাকর্ক দয়া ক'রে আমাদের সেটাউরটি সম্বন্ধে কিছু তথ্য দেবেন…সবচেয়ে জরুরি হ'লো তার আকিলিসের গোড়ালিটা সত্যি কোথায়, অর্থাৎ তার সব চেয়ে দুর্বল জায়গা কোথায়, সে-খবর জানা…'

ম্যাকর্ক গিয়ে আখানিয়ানের পাশে দাঁড়িয়েছে এখন। পির্ক্স আগে যতটা ভেবেছিলো, তার চেয়েও অনেক বেশি রোগা ম্যাকর্ক। তার কান দুটো খাড়া-খাড়া, মুখটা অনেকটা কোনো ত্রিভুজের মতো, প্রায় চোখেই পড়ে না এমনি তার ভুরু দুটি, ঝাঁকড়া চুলের রং যে কী সহজে বোঝাই যায় না, কিন্তু সব মিলিয়ে চেহারাটা অদ্ভুতভাবেই ভালো লেগে যায়।

কথা বলতে শুরু করার আগে ম্যাকর্ক তার স্টিলের দাঁড়ওলা চশমা খুলে ডেস্কের ওপর রাখলে, যেন চশমাটা তার কথা বলার পক্ষে এক মস্ত বাধা।

'এখানে যে-ধরনের ঘটনা ঘটেছে, আমরা তার সম্ভাবনা মেনে নিয়েছিলুম বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। তবে গণিত-বীজগণিত ছাড়াও রোবোট নির্মাতার মাথায় একটা-কোনো স্বজ্ঞাপ্রসূত ধারণা কাজ করে। ঠিক এই কারণেই আমরা আমাদের ডিজাইন অনুযায়ী বিস্তর রোবোট তৈরি ক'রেও এখনও বাজারে ছাড়িনি। আমাদের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা ক'রে দেখেছি যে মেফিস্টো চমৎকার সাবলীলভাবে কাজ করে—মেফিস্টো হ'লো আমাদের ডিজাইনের নাম। অনুমান করা হয়েছিলো যে সেটাউর আরো ওস্তাদ—এবং তার রাশটানার ক্ষমতাও অনেক বেশি কাজের। অন্তত আমি তা-ই ভেবেছিলুম—নির্মাতাদের কাগজপত্র প'ড়ে। এখন অবশ্য আমি ততটা সুনিশ্চিত নই। নামটা শুনে মনে হ'তে পারে সেটা বুঝি কোনো পুরাণ থেকে নেয়া, আসলে অবিশ্যি নামটা তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: সেল্‌ফপ্রোগ্রামিং ইলেকট্রনিক টারনারি অটোমেটন রাসেমিক—মারকিন ব'লে ইংরেজি কথা—অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় নিদানক্রম তৈরি-করা, তিল-তিল ক'রে অংশ জুড়ে বানানো, বৈদ্যুতিক, স্বতশ্চল, সমদূরবর্তী দুই কোষদণ্ডে বিন্যস্ত মস্তিষ্কসম্বল: কারণ তার মস্তিষ্ক তৈরি করবার জন্য দু-রকম উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এ-সব কথা এখানে তেমন জরুরি নয়। শুধু এটা জানা দরকার যে সেটাউর হ'লো আলোবিবর্ধক রশ্মিপ্রেরক যন্ত্রওলা এক রোবোট—খনির মধ্যে কাজ করার উদ্দেশ্যে নির্মিত—যে-রশ্মি সে ফেলতে পারে, তা বেগনি। রশ্মি তৈরি করার শক্তি আসে সূক্ষ্ম পরমাণু কণার একটি পুঞ্জ থেকে, শীতল এক পর-পর ঘ'টে-যাওয়া ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্র অনুযায়ী সে কাজ করে। সেই জন্যেই—যদি আমার সঠিক মনে থাকে—সেটাউর পঁয়তাল্লিশ হাজার কিলোওয়াট শক্তির রশ্মি পাঠাতে পারে।'

'কতক্ষণ ধ'রে?' কেউ একজন জিগেশ করলে।

'আমাদের মতে—চিরকাল,' রোগা বৈজ্ঞানিক তক্ষুনি জানালো। 'চিরকাল কথাটায় আপত্তি উঠলে বলা যায়, অনেক বছর ধ'রে। এই সেটাউরটিতে সত্যি কী ঘটেছে, এটাই প্রশ্ন। সহজ কথায়, আমার ধারণা,

নিশ্চয়ই তার মাথায় কোনো চোট লেগেছিলো। চোটটা নিশ্চয়ই খুবই জোরালো হয়েছিলো, কিন্তু কোনো ভেঙে-পড়া বাড়িও এখানে ক্রোমিয়াম আর দস্তায় তৈরি মাথার খুলি জখম ক'রে দিতে পারে। কাজেই প্রশ্ন, কী ঘটেছে তার ভেতরটায়? আমরা এ-রকম কোনো পরীক্ষা চালাইনি কখনো—তাতে দারুণ খরচ হ'তো,' হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে মৃদু হাসলো ম্যাকর্ক, তার দাঁতের পাটি চমৎকার শাদা, দাঁতগুলো ছোটো আর সমান মাপের। 'তবে এটা প্রায় সবারই জানা যে কোনো ছোটো, অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে সরল, কোনো মগজে কিংবা সাধারণ কোনো কম্পিউটারে যদি কোনো তীক্ষ্ণ ও তীব্র আঘাত লাগে, বিশেষত ছোট্ট, সংহত একটা জায়গায়, তাহ'লে তার কাজ করার সমস্ত ক্ষমতা চ'লে যায়, সে পঙ্গু হ'য়ে পড়ে। তবে আমরা যতই মনুষ্যমস্তিষ্কের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া লক্ষ ক'রে কম্পিউটারকে মানুষের মাথার মতো তৈরি করতে পারবো, ততই বেশি ক'রে সে আংশিক জখম হওয়া সত্ত্বেও কাজ ক'রে যেতে পারবে। জীবজন্তুর মস্তিষ্কে—যেমন, বেড়ালের মস্তিষ্কে—কতগুলো কেন্দ্র আছে, যেগুলোর মধ্যে উদ্দীপনা জাগলে তার মধ্যে আক্রমণের সাড়া জেগে ওঠে—আর তার দাঁত-নখের হিংস্রতায় তার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে। সেটাউরের মস্তিষ্ক অন্যভাবে তৈরি—তৎসত্ত্বেও তার কতগুলো সাধারণ তাড়া বা স্পৃহা আছে, কোনো কাজে লিপ্ত হবার ক্ষমতা আছে, যা বিভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত ও চালিত হ'তে পারে! এখন নিশ্চয়ই তার উদ্দেশ্য-কেন্দ্রে আর ধ্বংস ঘটানোর নিদানক্রমের মধ্যে কোথাও তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ হ'য়ে গেছে। বলাই বাহুল্য, আমি সবকিছু অতিরিক্ত সরলভাবে খুলে বলবার চেষ্টা করছি।'

'কিন্তু ধ্বংসের স্পৃহা কেন?' সেই একই কণ্ঠস্বরের প্রশ্ন।

'সেটাউর তো খনির মধ্যে কাজ করার জন্য তৈরি স্বতশ্চল একটি রোবোট,' ডক্টর ম্যাকর্ক ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালে। 'খনির মধ্যে তার কাজ হ'তো বিভিন্ন স্তরে বা পর্যায়ে খোঁড়া, পাথর ফুটো ক'রে দেয়া, বিশেষ কঠিন ধাতুগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করা—সাধারণভাবে বলতে গেলে অটল ও নিরেট পদার্থ ধ্বংস করা—স্পষ্টতই সর্বত্র বা সবকিছু নয়, কিন্তু চোটের ফলে তার কর্মসূচির সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে গেছে, তাই এই সাধারণীকরণ ঘ'টে গিয়েছে। তবে আমার অনুমানটা সম্পূর্ণ ভুলও হ'তে পারে। এ-প্রশ্নটা

একান্তই তাত্ত্বিক—পরে সেটা বিবেচনা ক'রে দেখার যোগ্য। কিন্তু এখন আমাদের প্রধান কাজ এই রোবোটটিকে অক্ষম ক'রে তোলা। এখন এটাই জানা জরুরি যে কী-কী কাজ করার ক্ষমতা তার আছে। যে-কোনো জমির ওপর দিয়ে—সমতল বা বন্ধুর, যাই হোক না কেন, তাতে কিছুই এসে যায় না—পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে সে যেতে পারে। এমন-কোনো জোড় নেই তার, যেখানে তেল লাগে—তার নিলম্বনগুলো চৌম্বক—কোনো রিভলভার বা বন্দুকের গুলি তার বর্ম ভেদ করতে পারবে না। পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়নি অবশ্য, তবে আমার মনে হয় কোনো ট্যাঙ্কবিধ্বংসী আগ্নেয়াস্ত্র··· কিন্তু তেমন-কিছু আমাদের তো নেই, আছে কি?'

আখানিয়ান মাথা নাড়লে। তালিকাটি এর মধ্যেই তার কাছে পৌঁছে গিয়েছিলো, সেটা তুলে নিয়ে সে এবার নামগুলোর পাশে ছোটো-ছোটো দাগ কাটতে লাগলো।

'স্পষ্টতই কোনো মোটামুটি জোরালো বিস্ফোরণে সে টুকরো-টুকরো হ'য়ে ভেঙে পড়বে,' ম্যাকর্ক শান্ত গলায় ব'লে গেলো, যেন সে অতিসাধারণ কোনো বিষয়ে কথা বলছে। 'কিন্তু প্রথমে তাকে তো বিস্ফোরকের কাছে আনতে হবে—আর সেটা খুব সহজ কাজ হবে না ব'লেই আমার আশঙ্কা।'

'আলোবিবর্ধক রশ্মিপ্রেরক যন্ত্রটা কোনখানে বসানো? তার মাথায়?' শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন জিগেশ করলে।

'সত্যি-বলতে মাথা ব'লে তার কিছু নেই, কেবল দুই কাঁধের মধ্যে একটুখানি জায়গা ফুলে উঠেছে। তার ওপর পাথর ধ্ব'সে পড়লেও তার যাতে বিশেষ ক্ষতি না-হয়, এই জন্যেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে—তার প্রতিরোধশক্তি বাড়িয়ে তোলার জন্য। সেটাউরের উচ্চতা দুশো বিশ সেন্টিমিটার, আর তার মানে মাটি থেকে দু-মিটার ওপরে কোনো-কিছু থেকে সে রশ্মি ছোঁড়ে; রশ্মিপ্রেরক নলটা ওঠানো-নামানো যায় এমন-একটা বুলেটপ্রুফ কাচ দিয়ে ঢাকা; যখন তার শরীর নিশ্চল, তখন সে তিরিশ ডিগ্রি কোণ ক'রে রশ্মি ছুঁড়তে পারে, আর যখন সে সচল, যখন তার সারা দেহ নড়ছে, তখন আরো বেশি জায়গা ভাগ ক'রে রশ্মি ছুঁড়তে পারে সে। রশ্মির সর্বগরিষ্ঠ শক্তি হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ হাজার কিলোওয়াট। এ যে দারুণ শক্তি, যে-কোনো বিশেষজ্ঞই তা বুঝতে পারবেন: এমনকী

খুব পুরু ইস্পাতের পাতও ভেদ ক'রে যেতে পারে অনায়াসে…'

'কতদূর থেকে ?'

'রশ্মিটা বেগনি, কাজেই তার ক্ষমতা সেদিক থেকে বেশি নয়—বেশ কাছের পাল্লাই হ'তে হবে…পাল্লাটা হবে, সব ব্যাবহারিক দিক থেকেই, দৃষ্টিসীমার মধ্যে ; এখানে দিগন্ত যেহেতু সমতল, আমি বলবো, দুই কিলোমিটার দূর অব্দি তার পাল্লা, কম ক'রেও দু-কিলোমিটার তো হবেই !'

'তার চেয়ে ছ-গুণ জোরালো বিশেষ রশ্মিপ্রেরক পাবো আমরা, সে-রশ্মিপ্রেরক খনিতে কাজ করার জন্য তৈরি,' আখানিয়ান জুড়ে দিলে।

'কিন্তু মারকিনরা তাকে বলে কামারের এক ঘা,' ম্যাকর্ক মৃদু হেসে বললে। 'সেটাউরের রশ্মিপ্রেরকের সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে তাতে খুব-একটা সুবিধে হবে ব'লে মনে হয় না…'

কেউ-একজন জিগেশ করলে কোনো মহাকাশযান থেকে রোবোটটাকে ধ্বংস করা সম্ভব হবে কিনা। ম্যাকর্ক বললে এ-প্রশ্নের উত্তর দেবার কোনো যোগ্যতাই তার নেই। আখানিয়ান ইতিমধ্যে হাজিরার পাতায় চোখ বুলিয়েছে ; সে বললে :

'আমাদের মধ্যে একজন প্রথমশ্রেণীর মহাকাশচারী আছেন। পির্‌ক্স… আপনি কি এ-বিষয়ে কিছু বলবেন ?'

পির্‌ক্স উঠে দাঁড়ালো।

'তাত্ত্বিক দিক থেকে বলা যায় যে আমার কুইভিয়েরের মতো কোনো মাঝারি গোছের মহাকাশযান, অর্থাৎ যোলো হাজার টনের কোনো মহাকাশযান, নিশ্চয়ই এ-রকম কোনো সেটাউরকে ধ্বংস করতে পারবে—যদি সরাসরি তার চোটের মুখে এসে পড়ে। নল দিয়ে যে-গ্যাস বেরোয় তার তাপ অন্তত নশো মিটার অব্দি ছ-হাজার ডিগ্রিরও বেশি। মনে হয়, তা-ই যথেষ্ট হবে।'

ম্যাকর্ক মাথা হেলিয়ে সায় দিলে।

'তবে এটা নেহাৎই জল্পনা মাত্র,' পির্‌ক্স ব'লে চললো। 'যানটাকে প্রথমত ঠিক অবস্থানে নিয়ে আসতে হবে আর সেটাউরের মতো কোনো ছোটো চাঁদমারি—আসলে সে তো মনুষ্যদেহের চাইতে মোটেই বড়ো

নয়—অনায়াসেই লক্ষ্যপথ থেকে স'রে যেতে পারবে—যদি-না তাকে কোনোরকমে নিশ্চল ক'রে ফেলা যায়। কোনো গ্রহের কাছে মহাকাশযানকে এদিক-ওদিক নড়ানো, বিশেষত গ্রহের মাধ্যাকর্ষণের পাল্লার মধ্যে, খুব-একটা সম্ভব নয়। হঠাৎ-হঠাৎ মোড় ঘোরা, এদিক-ওদিক যাওয়া, একেবারেই অসম্ভব। কাজেই বাকি যে-সম্ভাবনাটা আছে, তা হ'লো ছোটো যান ব্যবহার করা—যেমন চাঁদের নিজের কোনো মহাকাশযান। কিন্তু তার আবার আঘাতটা হবে দুর্বল, তাপমাত্রাও তেমন বেশি হবে না—কাজেই ও-রকম কোনো মহাকাশযান কেবল কোনো বোমারু বিমান হিশেবেই ব্যবহার করা যেতে পারে…কিন্তু একেবারে নিখুঁত ক'রে বোমা ফেলতে গেলে আবার বিশেষ যন্ত্র চাই: পাল্লার মাপ, আতশ কাচ, টেলিফোটো-লেন্স এই সব—আর লুনার এ-সব কিছুই নেই। না, মহাকাশযান ব্যবহার করার প্রস্তাবটা আমাদের খারিজ ক'রে দিতে হবে। নিশ্চয়ই এ-রকম কোনো ছোটো যান ব্যবহার করা দরকার হবে—এমনকী না-ক'রেই চলবে না—কিন্তু সে শুধু রোবোটটা কোথায় আছে তা খুঁজে দেখবার জন্য, নিছকই পরিদর্শন পরিক্রমার কাজে।'

ব'সে পড়বে, এমন সময় হঠাৎ একটা নতুন ভাবনা খেলে গেলো তার মাথায়।

'ও হ্যাঁ!' পিরুক্স ব'লে উঠলো, 'লম্ফবন্ধনী! সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন আপনারা। মানে, বলতে চাচ্ছি যে—আপনাদের এমন লোক চাই যারা লম্ফবন্ধনী ব্যবহার করতে জানে।'

'সেগুলো কি ঐ ছোটো রকেটগুলো, যা লোকে কাঁধে শক্ত ফিতে দিয়ে বেঁধে নেয়,' ম্যাকর্ক জিগেশ করলে।

'হ্যাঁ। সেগুলো দিয়ে প্যারাস্যুট বাহিনীর মতো লাফিয়ে পড়তে পারেন, অথবা, এমনকী কোনো নড়াচড়া না-ক'রেই, উড়ে যেতে পারেন; নির্ভর করবে কবেকার ডিজাইন আর কোন ধরনের লম্ফবন্ধনী, তার ওপর। এক মিনিট থেকে শুরু ক'রে বেশ-কিছুক্ষণ তার সাহায্যে ভেসে থাকা যায় শূন্যে, আর পঞ্চাশ থেকে চারশো মিটার অব্দি ওপরে ওঠা যায়…'

আথানিয়ান উঠে দাঁড়ালে।

'এটা খুব জরুরি হ'তে পারে। কারা-কারা লম্ফবন্ধনী-ব্যবহার করার

কৌশল শিখেছেন এখানে ?'

দুটো হাত উঠে গেলো। তারপর আরেকটা।

'মাত্র তিনজন ?' বললে আখানিয়ান। 'ওঃ, আপনিও জানেন ?' পিরুক্সও হাত তুলে দাঁড়িয়েছে এটা দেখে সে বললে। 'তাহ'লে সবশুদ্ধু চারজন। খুব বেশি নয় অবশ্য···ঠিক আছে, আমরা অন্যদেরও পরে জিগেশ ক'রে দেখবো। আচ্ছা, এটা নিশ্চয়ই বলার দরকার নেই যে এটা পুরোপুরি স্বেচ্ছাসেবকের কাজ। হয়তো এই কথা ব'লেই আমার আলোচনা শুরু করা উচিত ছিলো। আপনাদের মধ্যে কে-কে এই কাজে অংশ দিতে চান ?'

চেয়ার সরানোর শব্দ হ'লো, জুতোর আওয়াজ, কারণ উপস্থিত সকলেই উঠে দাঁড়িয়েছে।

'বন্দর-নিয়ন্ত্রণের তরফ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি,' আখানিয়ান বললে, 'ভালোই হ'লো··তাহ'লে আমাদের সবশুদ্ধু সতেরোজন স্বেচ্ছাসেবক আছেন। চান্দ্রবাহিনীর তিনটি দলও আমাদের সাহায্য করবে, তাছাড়া আছে দশজন শকটচালক আর বেতারচালক—তারা আমাদের তৈরি হ'তে সাহায্য করবে। আপনাদের সকলকেই এখানে অপেক্ষা করতে আমি অনুরোধ করবো। আর আপনারা দুজনে,' সে ম্যাকর্ক আর পিরুক্সের দিকে ফিরে তাকালে, 'যদি আমার সঙ্গে অনুগ্রহ ক'রে বন্দর-নিয়ন্ত্রণের আপিশে আসেন···'

বিকেল তখন চারটে হবে, পিরুক্স একটা মস্ত শুঁয়োপোকার মতো শকটে বসেছিলো, তার কামানটার সামনে; ঝাঁকুনি খেতে-খেতে এগুচ্ছে শকট, বেশ জোরালো একেকটা ধাক্কা লাগছে। পিরুক্স মহাকাশচারীর পোশাক প'রে আছে, আপাদমস্তক ঢাকা, শিরস্ত্রাণটা হাঁটুতে রেখেছে সে, যাতে বিপদসংকেত আসবামাত্র মাথায় দিতে পারে; বুকে ঝুলছে একটা ভারি আলোবিবর্ধক রশ্মিপ্রক্ষেপ যন্ত্র, তার বাঁটটা বেশ নির্দয়ভাবেই ঝাঁকুনির সঙ্গে-সঙ্গে বুকে খোঁচা লাগাচ্ছে, তার বাঁ হাতে একটা মানচিত্র, আর ডান হাতটা পেরিস্কোপ ঘোরাবার কাজে ব্যস্ত; অন্য শকটগুলোর ছড়িয়ে-পড়া দীর্ঘ সারির দিকে তাকালে সে; শকটগুলো শান্ত সমুদ্রের পথে জঞ্জালের

স্তূপের মধ্যে দিয়ে ঢেউয়ের ধাক্কায় আন্দোলিত নৌকোর মতো লাফাতে-লাফাতে এগুচ্ছে। ঐ 'মরুসাগর' সূর্যালোকে ঝলশে উঠেছে, এই কালো দিগন্ত থেকে ঐ কালো দিগন্ত অব্দি ঊষর জায়গাটা একেবারেই ফাঁকা। পিরক্স প্রতিবেদন পাচ্ছে, তারপর পাশের লোকের কাছে খবরগুলো চালান ক'রে দিচ্ছে, লুনা ১-এর সঙ্গে কথা বলছে, অন্য শকটগুলোর লোকদের সঙ্গে সংযোগ রাখছে, পরিদর্শক পরিক্রমার কাজে ব্যস্ত বিমানগুলোর পাইলটদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে, বিমানগুলোর পুচ্ছ থেকে বেরিয়ে আসছে আগুনের সরু-সরু ফিনকি—কালো আকাশের তারাগুলোর শিখাগুলো মধ্যে ঝলশে উঠছে মাঝে-মাঝেই—তবু সব সত্ত্বেও মাঝে-মাঝেই তার মনে হচ্ছিলো সে বোধহয় অতিবিশদ-কোনো উজবুক স্বপ্নের ঘোরে প'ড়ে আছে।

ঘটনাগুলো ঘটেছে প্রচণ্ড বেগে—আর প্রচণ্ডতাটা ক্রমেই বেড়েছে। নির্মাণদপ্তর মিথ্যে আতঙ্কে কাঁপছে, এই কথাটা কেবল তারই একা মনে হয়নি। কারণ, সত্যি-বলতে, একটা আহাম্মুক, মাথাখারাপ রোবোট, রশ্মিপ্রক্ষেপ যন্ত্রে সশস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও, কতটুকু ক্ষতিই বা করতে পারে? কাজেই ঠিক দুপুরবেলায় দ্বিতীয় পরামর্শ-সভায় যখন কথা উঠেছিলো যে রাষ্ট্রসংঘের কাছে সাহায্য চাওয়া হবে, নিদেন অন্তত নিরাপত্তা পরিষদের কাছে, 'বিশেষ সাহায্য' প্রার্থনা ক'রে, বিশেষত জোরালো গোলাগুলি আনবার অনুমতি চাওয়া হবে (হাউই প্রক্ষেপকই বোধহয় সবচেয়ে কাজে আসবে), এমনকী হয়তো পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রও আনা ভালো—পিরক্সও অন্যদের সঙ্গে-সঙ্গে আপত্তি তুলেছিলো: বলেছিলো, তাতে সারা পৃথিবীর কাছে তারা নিজেদের পুরোপুরি আহাম্মুক ক'রে তুলবে। তাছাড়া, এটা তো স্পষ্টই যে আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে অনুমতি আসতে কয়েক হপ্তা যদি নাও লাগে, তবু বেশ কিছুদিনই কেটে যাবে, আর ইতিমধ্যে 'পাগল রোবোট' কে-জানে-কোথায় হাওয়া হবে, কে জানে, আর-একবার যদি চাঁদের ফাটলের অনধিগম্য কোনো গর্তে গিয়ে ঢোকে, তাহ'লে জগতের সব কামান ব্যবহার ক'রেও তার টিকির ডগাটি ছোঁয়া যাবে না; কাজেই, এক্ষুনি, অযথা কোনো কালক্ষেপ না-ক'রে, তাদের স্পষ্ট কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। তখনি এটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিলো যে সবচেয়ে

বড়ো মুশকিল হবে যোগাযোগ রাখা, চিরকালই চাঁদে যোগাযোগ-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখাটা গোলমেলে ব্যাপার। যোগাযোগ-ব্যবস্থাকে সহজ ও সুষ্ঠু ক'রে তোলবার জন্য নাকি তিন হাজার বিভিন্ন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন আছে ব'লে শোনা যায়—ভূকম্পীয় বেতারব্যবস্থা (ছোটো-ছোটো বিস্ফোরণকে তাতে সংকেত হিশেবে ব্যবহার করা হয়) থেকে শুরু ক'রে স্থিরনিশ্চল 'ট্রোজান' উপগ্রহ অব্দি। মাত্র গত বছরই এই উপগ্রহগুলিকে কক্ষপথে পাঠানো হয়েছে—অবস্থার তাতে কোনো উন্নতিই হয়নি, কোনো উনিশ-বিশই নয়। দৈনন্দিন কাজের জন্য সমস্যাটার সমাধান করা হয়েছে ছোটো-ছোটো খুঁটি বসিয়ে অতিসমুদ্রে বিদ্যুৎলহরীপ্রেরক যন্ত্র প্রতিষ্ঠা ক'রে—স্পুটনিক মহাকাশে যাবার আগে পৃথিবীতে যেমনভাবে দূরদর্শনের জন্য ছবি ও কথা পাঠানো হ'তো। উপগ্রহ মারফৎ যোগাযোগ স্থাপন করার চেয়ে তা কিন্তু বাস্তবিক অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য; কারণ উদ্ভাবকেরা এখনও মাথার চুল ছিঁড়ছে কী ক'রে কক্ষপথে প্রেরিত ঐ উপগ্রহগুলিকে সৌরঝঞ্ঝার হাত থেকে বাঁচানো যায়। সূর্যের মধ্যে কোনো-কিছু ঘটলেই, সৌরকিরণের লাফঝাঁপ একটুখানি বাড়লেই, বিদ্যুতেভরা তীব্রশক্তি অণুকণাগুলোর হারিকেন মহাশূন্যে তুলকালাম ঘূর্ণি তোলে, ঈথার ছিঁড়ে চ'লে আসে, আর সঙ্গে-সঙ্গে স্থিতি তৈরি হয়, এবং তা যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব ক'রে তোলে—মাঝে-মাঝে এই অবস্থা চলে কয়েক দিন ধ'রে। ঠিক এই মুহূর্তেই ও-রকম একটা সৌরঝঞ্ঝা চলেছে—কাজেই লুনা ১ আর নির্মাণস্থলের মধ্যে বার্তাবিনিময় হচ্ছে ঐ ছোটো-ছোটো খুঁটিগুলোতে বসানো বিদ্যুৎলহরীপ্রেরক যন্ত্র মারফৎ। আর সেটাউর দ্বৈরথের সাফল্য নির্ভর করছে—অন্তত, বৃহৎ পরিমাণে—ঐ 'বিদ্রোহী' রোবোটের মাথায় যাতে খেয়াল না-ঢোকে যে ঐ খুঁটিগুলো ধ্বংস ক'রে ফেলা উচিত: চান্দ্রনগরী থেকে নির্মাণস্থলের মধ্যবর্তী মরুভূমিতে সবশুদ্ধু পঁয়তাল্লিশটা এ-রকম বিদ্যুৎপ্রেরক খুঁটি বসানো আছে। অবশ্য, এটা ধ'রেই নেয়া হয়েছে যে, পাগল রোবোটটি এখানটাতেই ঘোরাঘুরি করছে। চলাফেরা করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে তার, যেহেতু জ্বালানি বা অক্সিজেন কিছুরই তার দরকার নেই, তার দরকার হয় না বিশ্রাম কিংবা ঘুম, এককথায় সে এতই স্বয়ংসচ্ছল যে অবশেষে এই প্রথমবার অনেক বৈজ্ঞানিকই

অনুধাবন করলে তাদের বানানো যন্ত্র কী-রকম নিখুঁত, আর কী অসীম ক্ষমতা তাকে দেয়া হয়েছে। আর এই যন্ত্র এখন যে কী করবে, কী হবে তার পরবর্তী কাজ, তা কেউই আন্দাজ করতে পারলে না। চাঁদ আর পৃথিবীর মধ্যে সরাসরি যে-কথাবার্তা চলছে ভোরবেলা থেকে, বন্দর-নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে রোবোটনির্মাতা সংস্থার, এমনকী যারা সেটাউরের ডিজাইন করেছে, তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ ঘটানো হয়েছে, কিন্তু এখনো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়নি, আলোচনা চলেছে তো চলেছেই; তাদের কাছ থেকে নতুন কিছুই জানা যায়নি; ডক্টর ম্যাকর্ক গোড়াতেই তাদের যা বলেছিলেন, তারা শুধু তারই পুনরাবৃত্তি করেছে। রোবোট সম্বন্ধে যাদের কোনো ধারণাই নেই, তারাই শুধু বারে-বারে বিশেষজ্ঞদের অনুরোধ করছে কোনো মহাগণকযন্ত্র ব্যবহার ক'রে রোবোটের ক্রিয়াকৌশল কী হবে তা বার করবার চেষ্টা করতে। সেটাউর কি বুদ্ধিমান? হ্যাঁ, বুদ্ধিমান বটে, তবে নিজের ধরনে! যন্ত্রের ঐ 'অপ্রয়োজনীয়' – আর এই মুহূর্তে বিপজ্জনক – 'জ্ঞানবুদ্ধি' অনেককেই রুষ্ট ক'রে তুলেছে; তারা মোটেই বুঝতে পারছে না কেন শুধু খনির মধ্যে কাজ করার জন্য বানানো রোবোটকে এত স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য, স্বয়ম্বশতা দেয়া হয়েছে। ম্যাকর্ক শান্তভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বলেছে যে এই 'বুদ্ধিবৈদ্যুৎপর্যাপ্তি' – বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আজকাল এই কথাটার দারুণ চল—মোটেই নতুন-কিছু নয়, যে-কোনো সাধারণ ও প্রচলিত যন্ত্র বা ইনজিনেই শক্তির এই আতিশয্য দেখা যাবে: সংকটের সময়ের জন্য সঞ্চিত, যাতে গণ্ডগোলে পড়লে সে ভির্মি না-খায়, আসলে নিরাপত্তা বাড়াবার জন্যই তা দেয়া হয়, যাতে সে সব অবস্থাতেই নিজের কাজ ক'রে যেতে পারে। আগে থেকে এটা জানার কোনোই উপায় নেই যন্ত্রটি – তা সে তথ্যপ্রেরক বা কর্মসক্ষম যা-ই হোক না কেন – সে কোন-কোন অবস্থায় গিয়ে পড়বে। আর সেই জন্যেই কারু কোনো ধারণাই নেই যে সেটাউর এর পরে কী করবে। বলাই বাহুল্য বিশেষজ্ঞরা – যাঁরা পৃথিবীতে আছেন, তাঁরাও – তার পাঠিয়ে তাঁদের মতামত জানিয়েছেন: ঝামেলাটা হ'লো এই যে কারু সঙ্গেই কারু মতের কোনো মিল নেই, সব একে-অন্যের উলটো, পরস্পরের বিপরীত। কারু-কারু মতে সেটাউর 'কৃত্রিম' সব পদার্থ ধ্বংস করতে চাইবে, অর্থাৎ ঐ বিদ্যুৎ-

প্রেরক খুঁটি বা বিজলি তারের মতো জিনিশ: অন্যদের ধারণা তার পথে যা পড়বে তাকেই সে ধ্বংস করবে: চান্দ্রশিলা বা লোকজনেভরা শকট, যাই হোক না কেন, কিছুকেই সে রেহাই দেবে না। একদলের মতে এক্ষুনি সেটাউরকে আক্রমণ ক'রে ধ্বংস করা হোক; অন্যদল প্রস্তাব করেছে অপেক্ষা ক'রে দেখাই যাক সে কী করে। তবে একটা বিষয়ে কারুই কোনো মতভেদ নেই; যন্ত্রের সব ক্রিয়াকলাপের ওপর তন্নতন্ন নজর রাখা হোক – এটা সকলেরই অভিমত।

ভোরবেলা থেকেই চান্দ্রবাহিনী ছোটো-ছোটো বারোটা দলে ভাগ হ'য়ে শান্ত সমুদ্রে পর্যবেক্ষণ ক'রে বেরিয়েছে, সারাক্ষণ তারা যোগাযোগ রেখেছে নির্মাণস্থলের সঙ্গে (নির্মাণস্থল রক্ষা করার জন্য সেখানে এক প্রতিরোধ-বাহিনী সজাগ), আর তারা আবার নিয়ন্ত্রণ-দপ্তরের কাছে বিরতিহীনভাবে সব খবর পাঠিয়েছে। সেটাউরকে খুঁজে পাওয়া মোটেই কোনো সহজ কাজ নয়; এই বিশাল ঊষর বন্ধ্যাভূমিতে কত যে চিড় ফাটল আর গর্ত তার ইয়ত্তা নেই – সে-সব বসন্তের দাগের মতো খুদে-খুদে অগুনতি জ্বালামুখ—সেখানে কোথায় যে এই ছোট্ট একটা ধাতুর টুকরো লুকিয়ে আছে, তা খুঁজে পাওয়াই দুঃসাধ্য কাজ। কিন্তু প্রতিবেদনগুলো যদি নেতিবাচক হ'তো, তাহ'লেও একটা কথা ছিলো! কিন্তু এরই মধ্যে পর্যবেক্ষণ বাহিনী বেশ কয়েকবার বিপদসংকেত ক'রে নির্মাণস্থলে জানিয়েছে যে 'পাগল যন্ত্র'টিকে দেখা গেছে; পরে অবশ্য আবিষ্কৃত হয়েছিলো যে তারা যা দেখেছে তা আসলে কোনো অসাধারণ শিলাবিন্যাস অথবা রোদে-ঝলশে-ওঠা লাভাস্তরের একটি ঝকঝকে টুকরো; এমনকী রেডার ব্যবহার ক'রেও কোনো লাভ হয়নি – চাঁদের শিলাবন্ধুর ঊষর ভূমিতে প্রথম যখন অভিযান হয়েছিলো আর যখন উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম চেষ্টা করা হচ্ছিলো, তখন থেকেই কত যে ধাতুর পাত্র এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই: আছে হাউইয়ের খোল, বিস্ফোরকের আবরণ, আর যে কত রকম টিনের পাতের জঞ্জাল কে জানে; আর সেই সবই দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার মিথ্যে বিপদসংকেতের কারণ হ'লো। তার ফলে এতই বিশৃঙ্খলা আর গণ্ডগোল দেখা দিলো যে সদরদপ্তর শেষটায় ভাবলে সেটাউর যদি বেরিয়ে এসে কোনোকিছু আক্রমণ ক'রে বসে আর

দেখা দেয়, তবে তাও ঢের ভালো। তবে শেষবার যে-প্রতিবেদন এলো তাতে জানা গেলো যে সে বিদ্যুৎমিস্ত্রিদের ছোটো-একটা শকট আক্রমণ করেছে। তারপর সে যে কোথায় গেছে কেউ জানে না – যেন চান্দ্রশিলা হা ক'রে তাকে আস্ত গিলে ফেলেছে। কিন্তু সবাই অনুধাবন করলে যে ব'সে-ব'সে অপেক্ষা করা ছাড়া আর-কিছু করার নেই, বিশেষত নির্মাণ-স্থলকে যখন তার বিদ্যুৎশক্তির সরবরাহ ফিরে পেতেই হবে। দশ হাজার বর্গকিলোমিটার জুড়ে কাজ করতে হবে, সন্ধানবাহিনীকে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখতে হবে সব জমি – তাই দুই বিপরীত দিক থেকে অর্থাৎ উত্তর আর দক্ষিণ থেকে দুই সারি শকট সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। নির্মাণস্থল থেকে এসেছে তাদের প্রধান প্রয়োগবিদ্ স্তিবোরের নেতৃত্বে একটা ছড়িয়ে-পড়া বাহিনী, আর নিয়ন্ত্রণ-দপ্তর থেকে বেরিয়েছে দ্বিতীয়টি, আর দ্বিতীয় দলে আছে পিরুক্স, তার ওপরেই ভার দু-দলের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর, আর নিয়ন্ত্রণ-দপ্তরের প্রধান কমোডোর আকাশচারী প্লেইডারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার দায়িত্বটাও তারই। এটা সে খুব ভালো-ক'রেই বুঝতে পেরেছিলো যে-কোনো মুহূর্তে তারা সেটাউরের পাশ দিয়েই চ'লে যেতে পারে; ঐ গভীর পরিখাগুলোর কোনো-একটার মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে সে অথবা ঝকঝকে চান্দ্রবালুকার প্রতিফলনের মধ্যে তার ধাতুরচিত অবয়ব এমনভাবে ঢাকা প'ড়ে যেতে পারে যে তাদের হয়তো আদৌ কারু চোখেই পড়বে না। ম্যাকর্ক 'বুদ্ধিবৈদ্যুৎ-উপদেষ্টা' হিশেবে তার সঙ্গে চলেছে – তারও সেই একই অভিমত।

শকট চলেছে ধাক্কা খেতে-খেতে; চালক তাদের শান্তভাবে জানালে যে শকটের বেগ 'একসময় হয়তো তাদের চোখ দুটো কোটর থেকে উপড়ে আনবে'। এখন তারা আছে শান্ত সমুদ্রের পুব দিকটায় – রোবোটটা যেখানে আছে ব'লে অনুমান, তার চেয়ে হয়তো বড়োজোর ঘণ্টাখানেক দূরে। যে-সীমার মধ্যে তাকে শেষ দেখা গেছে, সেখানে পৌঁছেই তাদের সবাইকে শিরস্ত্রাণ প'রে নিতে হবে, যাতে অপ্রত্যাশিত আক্রমণে, শকটের বর্ম ভেঙে গেলে, অথবা আগুন লাগলে, তারা চটপট শকট থেকে নেমে পড়তে পারে।

শকটটা এখন পরিণত হয়েছে সশস্ত্র এক সমরযন্ত্রে; তার গম্বুজের মতো

চুড়োয় যন্ত্রবিৎরা বসিয়েছে খুব জোরালো এক আলোবিবর্ধক রশ্মিপ্রক্ষেপ যন্ত্র ; ঠিকমতো তাগ ক'রে রশ্মি ফেলা তার পক্ষে ততটা সহজ হবে না, কারণ যন্ত্রটা খনির ভেতরে সাধারণভাবে কাজ করার জন্যেই তৈরি। পির্ক্সের মতে সেটাউরের বিরুদ্ধে দ্বৈরথে সেটা মোটেও কাজে লাগবে না। সেটাউরে একটা স্বয়ংক্রিয় দৃষ্টিকল বসানো আছে – তার বৈদ্যুতিক চোখগুলো সরাসরি রশ্মিপ্রক্ষেপ যন্ত্রের সঙ্গে তার দিয়ে যোগাযোগ করা, যাতে কোনো-কিছু তার চোখে পড়বামাত্র সে রশ্মি ছুঁড়তে পারে। তাদের নিজেদের দৃষ্টিকলটি তার তুলনায় একেবারেই সেকেলে, সম্ভবত কোনো আদিম মহাকাশ-নিরীক্ষণ-যন্ত্রেরই কোনো ছোট্ট সংস্করণ ; লুনা ছেড়ে আসার আগে তারা তার ক্ষমতা পরীক্ষা করেছিলো – দিগন্তে বসানো কতগুলো পাথর লক্ষ্য ক'রে রশ্মি ছুঁড়েছিলো তারা ; পাথরগুলো ছিলো বিশাল, আর দূরত্ব দু-কিলোমিটারও হয়তো হবে না ; তবু শুধু চারবারের বার তারা তাগমতো রশ্মি ছুঁড়তে পেরেছিলো। আর এখানে তো অবস্থা আরো-বিষম ; চাঁদের এই ঊষরবন্ধুর অবস্থাকেও শামাল দিতে হবে ; আর আলো-বিবর্ধক রশ্মি শুধু কোনো বিকিরণকর আবহাওয়াতেই ঝলশে উঠতে পারে – অর্থাৎ পৃথিবীর আবহাওয়ায় ; কিন্তু বায়ুমণ্ডলহীন এই শূন্যতায় কোনো আলোর রশ্মি যতই জোরালো হোক না কেন, কোনো নিরেট বাধার গায়ে ঘা না-দেয়া অব্দি চোখেই পড়বে না। পৃথিবীতে তাই বন্দুকের গুলির মতোই এই রশ্মি ছোঁড়া যায়, যেহেতু তার শূন্যচারী গতির রেখা টেলিফোটো লেন্সে দেখা যায়। কিন্তু কোনো জোরালো পরকলা বসানো দৃষ্টিকল ছাড়া রশ্মিপ্রক্ষেপ যন্ত্র চাঁদের পিঠে প্রায় কোনো কাজেই লাগবে না। ম্যাকর্ককে পির্ক্স এ-কথা যখন খুলে বললে, তখন তারা অনুমিত বিপজ্জনক এলাকা থেকে মাত্র দু-মিনিট দূরে আছে।

'সে-কথা আমি মোটেই ভাবিনি,' বললে ম্যাকর্ক, তারপর একটু হেসে জিগেশ করলে :

'আমাকে বললেন কেন ?'

পেরিস্কোপে চোখ লাগিয়ে রেখেই পির্ক্স উত্তর দিলে, 'যাতে কোনো অহেতুক প্রত্যাশা না-থাকে আপনার।' পেরিস্কোপে চোখ লাগাবার জায়গায় ফোম-রবারের কুশন, কিন্তু পির্ক্সের মনে হ'লো সে যদি এই অভিযান থেকে

জ্যান্ত ফিরতে পারে, তবে তাকে যে কতদিন চোখে কালশিঁটে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে তার ঠিক নেই। 'আর কেন আমরা এটাকে পেছনে বসিয়েছি, সে-কথাটাকেও ব্যাখ্যা করবার জন্যে।'

'আর ঐ সিলিণ্ডারগুলো?' জিগেশ করলে ম্যাকর্ক। 'আপনাকে আমি গুদোম থেকে ওগুলো বার ক'রে আনতে দেখেছি। কী আছে ওগুলোয়?'

'অ্যামোনিয়া, ক্লোরিন আর হাইড্রোকারবন, না কী যেন,' বললে পির্ক্স। 'মনে হ'লো হয়তো ওগুলো কোনো কাজে লেগে যাবে…'

'গ্যাসের ধোঁয়ার পরদা?' ম্যাকর্ক জানতে চাইলো।

'না, ঠিক তা নয়। আসলে আমি ভেবেছিলুম তাগ করতে যাতে সুবিধে হয়, এমন-কিছু বানাবো। এখানে তো কোনো বায়ুমণ্ডল নেই, তো আমরাই না-হয় অন্তত অস্থায়ীভাবে একটা আবহাওয়া বানিয়ে নিলুম…'

'শঙ্কা হয় যে তার হয়তো সময়ই পাওয়া যাবে না।'

'হয়তো যাবে না…তবে যদি কখনো কাজে লেগে যায়, এই ভেবেই সঙ্গে নিয়ে এসেছি। যে পাগল, তার বিরুদ্ধে হয়তো পাগলাটে কোনো উপায়ই সবচেয়ে ভালো…'

তারা চুপ ক'রে গেলো, কারণ শকট এখন যেহেতু এগুচ্ছে মাতালের মতো টলতে-টলতে। স্থিতিস্থাপকগুলো কী-রকম ভঁশ-ভঁশ ঘষঘষ আওয়াজ করছে, যেন তাতে যে-তেল ভরা আছে তা যে-কোনো মুহূর্তে টগবগ ক'রে ফুটতে শুরু করবে। শকট এখন এগুচ্ছে বড়ো-বড়ো পাথরের চাঁই ছড়ানো এক ঢালের ওপর দিয়ে। উলটো দিকের ঢালটা ঝকঝক করছে রোদে, ঝামা পাথরের মতো ধবধবে।

'জানেন, আমার সবচেয়ে বড়ো ভয় কী?' টালমাটাল চলন একটু ধাতস্থ হ'য়ে গেলে পির্ক্স আবার কথা শুরু করলে; হঠাৎ কী-রকম অদ্ভুতভাবে তাকে কথা বলার বাই পেয়ে বসেছে। 'সেটাউর নয় – না, মোটেই সে নয়। —বরং নির্মাণস্থল থেকে আনা ঐ শকটগুলো। একবার যদি তাদের কোনোটার ধারণা হয় যে আমরাই সেটাউর, আর তখন যদি রশ্মি ছুঁড়তে শুরু ক'রে দেয়, ব্যস, তাহ'লেই খেলা জ'মে উঠবে।'

'আপনি দেখছি সবকিছুই ভেবে দেখেছেন,' বিড়বিড় ক'রে বললে মাকর্ক। পেছনে, বেতারচালকের পাশে যে-শিক্ষানবিশটি ব'সে ছিলো সে ঝুঁকে প'ড়ে পিরক্সের হাতে একটা তারবার্তা তুলে দিলে – আঁকাবাঁকা হরফে লেখা, অনেক চেষ্টায় কোনোরকমে পাঠোদ্ধার করা যায়।

'আমরা এখন বিপজ্জনক এলাকায় পৌঁছেছি – বিশ নম্বর বিদ্যুৎপ্রেরক খুঁটির কাছে, এখনও কিছু চোখে পড়েনি, দাঁড়ি, সৃত্‌শিবোর, বার্তার শেষ,' পিরক্স শুনিয়ে-শুনিয়ে পড়লো। 'তা আমাদেরও চটপট শিরস্ত্রাণগুলো প'রে নিতে হবে…'

এবার ঢাল বেয়ে উঠছে ব'লে শকটের গতি একটু মন্থর হ'য়ে এলো। পিরক্স লক্ষ করলে যে বাঁ-পাশের শকটটিকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না, কেবল ডান দিকের শকটটি তীর ঘেঁষে একটা অস্পষ্ট ছায়ার মতো চলেছে। বাঁপাশের শকটটার সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ করতে হুকুম দিলে সে, কিন্তু কোনো সাড়াই পাওয়া গেলো না।

'এবার আমরা পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা হ'য়ে যেতে শুরু করেছি ;' শান্ত গলায় সে বললে। 'এ-রকম যে হ'তে পারে, আমি তা আগেই ভেবেছিলুম। অ্যানটেনাটা আরেকটু ওপরে টেনে তোলা যায় না? না? হুম্। এটা ভালো কথা নয়!'

এতক্ষণে তারা ঢালটা বেয়ে ওপরে উঠে এসেছে – খুব উঁচু নয় অবিশ্যি। দূরে, দিগন্তে, দুশো কিলোমিটারও হবে কি না সন্দেহ, রৌদ্রে ঝলশে উঠেছে টোরিসেল্লি জ্বালামুখের করাতের দাঁতের মতো আলবালটি – আকাশের কালো পটের পেরিপ্রেক্ষিতে রূঢ়ভাবে ফুটে উঠেছে দাঁতগুলো। শান্ত সমুদ্রের সমভূমি এখন তাদের পেছনে প'ড়ে আছে উষর। গভীর সব খাদ আর ফাটল দেখা দিতে লাগলো এখন, জঞ্জালস্তূপ থেকে মাঝে-মাঝে এলোমেলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু-উঁচু জমাট লাভার ফলা, আর এ-সবের ওপর দিয়ে শকট এখন বুকে হেঁটে এগুচ্ছে দারুণ অসুবিধের মধ্যে, ঢেউয়ের ওপরে নৌকোর মতো উঠছে একবার, তারপরেই নেমে আসছে, যেন এই বুঝি গিয়ে পড়বে কোনো অজ্ঞাত ফাটলের মধ্যে বেশামাল, উলটে যাবে, ডিগবাজি খাবে। পরবর্তী বিদ্যুৎ-খুঁটিটার উঁচু মাস্তুলের মতো ডগাটা চোখে পড়লো পিরক্সের, চটপট সে হাঁটুর ওপর মেলে-রাখা

মানচিত্রটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলে, তারপরেই সবাইকে হুকুম করলে মাথায় শিরস্ত্রাণ এঁটে নিতে। এখন থেকে তারা শুধু ভেতরকার টেলিফোনের সাহায্যেই পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। শকট কেমন ক'রে যেন আগের চেয়েও আরো বেশি ঝাঁকুনি খেতে লাগলো : খোশা-খুলে-ফেলা খোলার মধ্যে একটা বাদামের মতো পির্‌ক্সের মাথা তার শিরস্ত্রাণের মধ্যে হুডবড় করতে লাগলো।

ঢাল বেয়ে আবার যখন তারা নিচের জমিতে নেমে এলো, টোরিসেল্লির দাঁতগুলো অদৃশ্য হ'য়ে গেলো - সামনের খাড়াইটা তাদের আড়াল ক'রে দিয়েছে। আর ঠিক সেই সঙ্গে তারা ডান পাশের শকটটিকেও হারিয়ে ফেললো। আরো কয়েক মিনিট অবশ্য শোনা গেলো তার বেতার-সংকেত ; তারপর বন্ধুর পাথরের ওপর যখন বিদ্যুৎতরঙ্গ ধাক্কা খেতে লাগলো, তখন প্রথমে সংকেতগুলো কেমন স্খলিত হ'য়ে গেলো – তারপর একেবারেই হারিয়ে গেলো, বেতারে এখন শুধুই স্তব্ধতা। শিরস্ত্রাণ-পরা অবস্থায় পেরিস্কোপ চোখে লাগিয়ে কিছু দেখা দারুণ অসাধ্য ব্যাপার : পির্‌ক্সের মনে হ'লো শেষটায় শিরস্ত্রাণের কাচটাই না ফেটে যায় – পেরিস্কোপের নলও ধাক্কা লেগে নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে। তবু এই অবস্থায় যতটা সম্ভব তা-ই সে করলে, চেষ্টা করলে যাতে দৃষ্টি সজাগ রাখতে পারে, যদিও শকটের একেকটা উঁচু-নিচু ধাক্কায় দৃষ্টি কেবলই ফশকে যাচ্ছে – আর এখানে পাথরের উঁচু-নিচু চাঁইগুলো যেন অন্তহীন ছিটিয়ে আছে। মিশমিশে কালো ছায়া আর পাথরের ঝকঝকে-উজ্জ্বল উপরিতল এমনভাবে তালগোল পাকিয়ে গেছে যে তার চোখে ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। হঠাৎ দূর আকাশের কালোছায়ায় ঝলশে উঠলো ছোট্ট এক-কমলা রঙের অগ্নিশিখা। তারপর এলোমেলো কেঁপে ক্রমে আবার সেটা মিলিয়ে গেলো। তারপরেই এলো দ্বিতীয় ঝলক, এবার আগের চেয়ে একটু জোরালো। পির্‌ক্স চেঁচিয়ে বললে : 'সব্বাই সজাগ! আমি দূরে বিস্ফোরণ দেখতে পাচ্ছি!' কেমন জ্বরাতুরভাবে সে পেরিস্কোপের হাতল ঘোরাতে লাগলো, যখন শকটের ধাক্কায় পরকলার গা থেকে দিগন্ত ফশকে গেলো।

'আমরা রাস্তা পালটাচ্ছি!' গর্জন ক'রে সে বললে, 'সাতচল্লিশ দশমিক আট – পুরোদমে চলো!'

এভাবে হুকুম দেয়া হয় মহাকাশযানে, তবে চালক তা ঠিকই বুঝতে পেলে; শকটের সব পাত সব জোড় শিউরে উঠলো, ঝনঝন ক'রে উঠলো। আর শকট তার চাকাগুলো যেন এক জায়গায় দাঁড়িয়েই ঘোরালো, আর ধাক্কা দিয়ে-দিয়ে এগুলো নতুন পথে। পিরুক্স তার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে, শকটের ধাক্কায় কিছুতেই সে পেরিস্কোপে চোখ এঁটে রাখতে পারছে না। আরেকটা ঝলক! রংটা এবার লাল-বেগুনি, পাখার মতো শিখা ফেটে পড়লো শূন্যে। কিন্তু বিস্ফোরণ আর শিখাগুলোর উৎপত্তি যে কোথায়, সেটা সামনের খাড়াইটার জন্যে মোটেই চোখে পড়ছে না।

'সব্বাই সজাগ!' বললে পিরুক্স। 'প্রত্যেককে নিজের-নিজের রশ্মি-প্রক্ষেপক তৈরি রাখতে হবে! ডক্টর ম্যাকর্ক, আপনি দরজাটার কাছে চ'লে যান। আমি বললেই অথবা রশ্মি এসে পড়লেই আপনি দরজা খুলে দেবেন! চালক! আপনি গতিবেগ কমান!'

মরুভূমি থেকে ওঠা যে-খাড়াই বেয়ে শকট ঝনঝন ক'রে উঠছে, তাকে দেখাচ্ছে চাঁদের কোনো অতিকায় দৈত্যের মতো; জঞ্জালে আবর্জনায় সে অর্ধেক ডোবা। সত্যি-বলতে, এতই মসৃণ যে পাথরটাকে কোনো কঙ্কাল বা অতিকায় করোটির মতো দেখাচ্ছে; পিরুক্স চালককে হুকুম করলে খাড়াইয়ের চুড়োয় চ'লে যেতে। চাকাগুলো কেমন কর্কশ একটা ঝনঝনে সুর তুলেছে, যেন কাচের ওপর কেউ ইস্পাতের ফলা টেনে নিচ্ছে। 'থামুন!' পিরুক্স চীৎকার ক'রে বললে, আর শকট, আচমকা রাশ টানবামাত্র, পাথরের দিকে নাকমুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম করলে, তারপর টাল খেলে, রাশগুলো চাপ প'ড়ে কাৎরে উঠলো, তারপর শকট থেমে পড়লো।

দু-পাশে পুরোনো লাভার স্রোত জমাট বেঁধে বাঁধ তুলেছে, আর মাঝখানে প'ড়ে আছে জ্বলন্ত সূর্যের তলায় ঝলশিত, আর এক-তৃতীয়াংশ ঘুটঘুটে কালো ছায়ার কাফনে ঢাকা। পিরুক্স তাকিয়ে দেখলে ঐ মখমলের মতো মিশকালো অন্ধকারে ঝলমল করছে, কোনো উদ্ভট মণির মতো, একটা শকটের ছেঁড়া-চেরা কঙ্কাল, প্রবালের মতো লাল। পিরুক্স ছাড়া শুধু চালকই দৃশ্যটা দেখতে পেলে, কারণ জানলাগুলোর ওপর এতক্ষণে বর্মের ঢাকা নামিয়ে দেয়া হয়েছে। সত্যি-বলতে, পিরুক্স কী যে করবে, তা

ভেবেই পেলে না। 'একটা শকট,' ভাবলে সে, 'কিন্তু কোথায় তার সামনেটা? কোনখানে? দক্ষিণ থেকে আসছিলো? হয়তো নির্মাণশিবিরের শকট তাহ'লে। কিন্তু কে তাকে পেলে? সেটাউর? না কি ভুল ক'রে অন্য-কোনো শকট? আর আমি কি না এখানে দাঁড়িয়ে আছি, চোখের ওপর, জলজ্যান্ত এক চাঁদমারি, হাঁদার মতো। যে-ক'রেই হোক আমাদের লুকিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু অন্য শকটগুলো কোথায়? নির্মাণ-শিবিরের আর আমার?'

'কিছু-একটা আওয়াজ শুনতে পেয়েছি!' বেতারচালক চেঁচিয়ে উঠলো। ভিতরকার বিদ্যুৎলহরীর সঙ্গে গ্রাহকযন্ত্রটি জুড়ে দিলে সে, যাতে শিরস্ত্রাণের মধ্যেই সবাই সংকেতগুলো শুনতে পায়।

'টিলার তলাকার ঢালু টুকরোর পুঞ্জ! ফাটল-ধরা এক দেয়ালের মতো – সদরদপ্তর থেকে পুনরাবৃত্তি করার দরকার নেই – বহুস্ফটিক শিলাবিন্যাস তার – দিগন্তের কাছে সেখানে পৌঁছনো যাবে…' পির্ক্সের কানে-লাগানো বেতারযন্ত্র ভ'রে গেলো কণ্ঠস্বরে, উচ্চারণ সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ, একটানা, একঘেয়ে, কোনো উত্থানপতন নেই তাতে।

'এটা তো তার গলা।' চেঁচিয়ে উঠলো পির্ক্স। 'সেটাউর! হ্যালো, হ্যালো, বেতারচালক! এক্ষুনি বার করার চেষ্টা করুন আওয়াজটা কোত্থেকে আসছে! ও কোথায় আছে আমাদের জানা দরকার। ভগবানের দোহাই! তাড়াতাড়ি করুন – যতক্ষণ সে বেতারে খবর পাঠাচ্ছে!' শিরস্ত্রাণের মধ্যে তার গলা এমনিভাবে বিস্ফারিত গ'র্জে উঠলো যে তার নিজেরই কানে তালা লেগে গেলো। বেতারচালকের কোনো সাড়া পাবার অপেক্ষা না-ক'রেই মাথা নুইয়ে লাফ দিলে শকটের ওপরটায়, ভারি রশ্মিপ্রেরক যন্ত্রটার হাতল ধরলো দু-হাতে, তার চোখ দৃষ্টিকলের কাচে বিনস্ত; যন্ত্রটার নল সে দ্রুত হাতে ঘোরাতে শুরু ক'রে দিলে। আর সারাক্ষণ তার শিরস্ত্রাণের মধ্যে সেই নিচু, প্রায়-বিমর্ষ গুঞ্জন চলেছে একটানা:

'টুকরোগুলোয় কোনো বৈচিত্র্য নেই, শিলাস্তরের বিন্যাস একই রকম, লাভাপুঞ্জের রূপান্তর অনুজ্জ্বল…' অর্থহীন এই কিচিরমিচির, কোনো-কোনো শব্দ ভূতাত্ত্বিক পরিভাষায় সচল, কিন্তু সব মিলিয়ে কথাগুলোর কোনো সুস্পষ্ট

অর্থ হয় না। তারপরেই স্বর আস্তে আস্তে দুর্বল হ'য়ে এলো।

'কোত্থেকে আসছে শব্দটা, কোত্থেকে ?!'

পিরক্সের চোখ দৃষ্টিকলের কাচে যেন আঠা দিয়ে আটকানো। হঠাৎ সে ক্ষীণ একটা খটাখট শব্দ শুনতে পেলে: ম্যাকর্ক ছুটে এসেছে সামনে, ধাক্কা দিয়ে বেতারচালককে সে সরিয়ে দিলে, একটা হুটোপাটির শব্দ…

হঠাৎ তার কানে ভেসে এলো বৈজ্ঞানিকের শান্ত কণ্ঠস্বর:

'দিগ্বলয় ৩৯ দশমিক ৯,…৪০ দশমিক ০…৪০ দশমিক ১…৪০ দশমিক ২…'

'সে স'রে যাচ্ছে!' পিরক্স বুঝতে পারলে। হাতল টেনে-টেনে রশ্মিপ্রেরকের চোঙ ঘোরাতে হয়: এত জোরে সে হাতল ধ'রে টান দিলে তার হাত দুটোই বুঝি কাঁধের জোড় থেকে খুলে আসবে। পরকলায় নম্বরগুলো যেন হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে। লাল রেখা ৪০ পেরিয়ে এলো।

হঠাৎ সেটাউরের গলা ধ্বনিত হ'লো কর্কশ ও তীক্ষ্ণ, তারপরেই থেমে গেলো। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘোড়া টিপলো পিরক্স, আর আধ কিলোমিটার দূরে, আলোছায়ার রেখায়, একটা পাথর জ্ব'লে উঠলো দাউ-দাউ, সূর্যালোকের চেয়েও উজ্জ্বল।

পুরু দস্তানার জন্য হাতলটাকে ভালো ক'রে চেপে ধরাটাই অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে। অববাহিকার তলায় চোখ-ধাঁধানো আগুন ছড়িয়ে পড়লো, তারপর অস্পষ্ট উজ্জ্বল ধ্বংসাবশেষের কয়েক ডজন মিটার দূরে আগুনের শিখা থমকে দাঁড়ালো একটু, ফিনকি দিয়ে চারপাশে ছিটিয়ে দিলে এলোমেলো জ্বলন্ত অঙ্গার, একপাশে রেখা এঁকে ছিটকে এগুলো, দু-বার স্তম্ভ তুললো স্ফুলিঙ্গের। কানে-লাগানো বেতারযন্ত্রে কী যেন গুঞ্জন ক'রে উঠলো। পিরক্স কোনো পাত্তাই দিলে না, সে চ'ষে বেড়ালো সেই অগ্নিশিখার প্রজ্বলন্ত রেখা, এত সরু এত ভয়ানক, তারপর শিখা ঘা খেলো কোনো-এক পাথরের থামে, ছিটকে ছড়িয়ে পড়লো হাজার টুকরোয়, হাজার ফিনকিতে। তার চোখের সামনে নাচছে জ্বলন্ত লাল বৃত্তের ঘূর্ণি, কিন্তু সেই ঘূর্ণির মধ্যে দিয়েই সে দেখতে পেলে উজ্জ্বল নীল এক চোখ, আলপিনের ডগার চেয়েও বোধহয় ছোটো, অন্ধকারের তলদেশ থেকে সে তাকিয়ে আছে ড্যাবড্যাব ক'রে, একপাশেই কোথাও, সে যেখানে

রশ্মি ছুঁড়ছিলো সেখানে নয়। আর রশ্মিপ্রেরকের নলটা সে ঘোরাবার আগেই, তার চাকার ওপর ঘুরিয়ে দিয়ে নলের মুখটা তাগ করার আগেই, ঠিক তাদের শকটের পাশেই একটা পাথর তরল রৌদ্রের মধ্যে সশব্দে ফেটে গেলো।

'পেছিয়ে!' হাঁক পাড়লে সে, আর আপনা থেকেই মাথা নোয়ালে, কিছু না-ভেবেই, শুধু প্রতিবর্তী অভ্যাসের বশে, আর তার ফল হ'লো এই যে এখন কিছুই আর তার চোখে পড়ছে না – কিন্তু, তা না-হ'লেও, এমনিতেই কিছুই হয়তো তার চোখে পড়তো না – শুধু ওই মিলিয়ে-যেতে-থাকা ঘূর্ণ্যমান আরক্তিম বৃত্তগুলো ছাড়া, এই তারা কালো হ'য়ে উঠলো, এই সোনালি!

শকটের ইনজিনে বাজ্ফাটানো আওয়াজ উঠলো। এত জোরে ঝাঁকুনি লাগলো যে পিরক্স ছিটকে পড়লো গম্বুজ থেকে তলায়, আর ছিটকে চ'লে গেলো একেবারে সামনে, বেতারচালক আর শিক্ষানবিশটির হাঁটুর কাছে; বর্ম আঁটা দেয়ালে আঁটো ক'রে বেঁধেছিলো তারা সিলিণ্ডারগুলো, সেগুলো বিকটভাবে ঝনঝন আওয়াজ ক'রে উঠলো। তারা হুড়মুড় ক'রে পিছোচ্ছে এখন; শকটের তলায় ভীষণ একটা মড়মড় আওয়াজ হ'লো, তারা ট'লে পড়লো একপাশে, তারপরে, আবার উলটো দিকে টাল খেলো, একবার মনে হ'লো বুঝি উলটেই যাবে পুরোপুরি।…চালক মরিয়ার মতো গ্যাসের চোঙ, ব্রেক, ক্লাচ – সবকিছু যেন দশহাতে টান লাগালে; কেমন ক'রে জানে না শেষটায় সেই বন্য টালমাটাল অবস্থাটা শামলে নিলে সে; শকট থরথর ক'রে কেঁপে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

'বর্মটা আছে এখনও?!' মেঝে থেকে উঠতে-উঠতে চেঁচিয়ে জিগেশ করলে পিরক্স। 'ভাগ্যিশ রবারের তৈরি,' এরই মধ্যে সে একঝলক ভেবে নিলে।

'হ্যাঁ, এখনও অটুট!'

'যাক, জব্বর গা ঘেঁষে গেছে!' তার গলার স্বর একেবারেই অন্যরকম শোনালো। সে উঠে দাঁড়ালো সটান, খাড়া হ'য়ে; তারপর নিচু স্বরে বললে, একটু উত্ত্যক্ত গলায়: 'আর একবিন্দু বাঁ পাশে হ'লেই তাকে ঘায়েল করতে পারতুম…'

ম্যাকর্ক তার নিজের জায়গায় ফিরে গেলো।

'ধন্যবাদ, ডক্টর ম্যাকর্ক, আপনি বেতারে ব'সে ভালো করেছিলেন!' পির্ক্স চেঁচিয়ে বললে। আবার সে ততক্ষণে তার পেরিস্কোপের কাছে ফিরে গেছে। 'হ্যালো, চালক, শুনুন—যে-রাস্তা দিয়ে এসেছি, সেই রাস্তা ধ'রেই ফিরে চলুন। ওখানে ঐ যে কতগুলো ছোটো টিলা আছে, অনেকটা তোরণের মতো—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐখানে!—সেখানে নিয়ে চলুন, ছায়ার মধ্যে, তারপর সেখানে গিয়ে থামবেন…'

আস্তে-আস্তে, যেন কোনো অতিরঞ্জিত সাবধানীভাবে, শকট বালির মধ্যে আধো-জাগা পাথরগুলোর মধ্যে দিয়ে এগুলো, তারপর তাদের ছায়ায় গিয়ে থেমে পড়লো; এবার ছায়া তাকে ঢেকে ফেলেছে—যেন সে পুরোপুরি অদৃশ্য হ'য়ে গেছে।

'চমৎকার!' পির্ক্সের গলায় প্রায় ফুর্তির সুর। 'এবার দুজন সঙ্গী চাই আমার, আমার সঙ্গে যাবে, একটু সরেজমিন তদন্ত ক'রে দেখতে…'

ম্যাকর্ক তার হাত তুললো, সেই সঙ্গে শিক্ষানবিশটিও।

'বেশ!' ব'লে সে অন্যদের দিকে ফিরলো: 'এবার শুনুন, আপনারা এখানেই থাকবেন, খবরদার, ছায়া থেকে কখনও বেরুবেন না—এমনকী সেটাউর যদি সরাসরি আপনাদের দিকে ধেয়ে আসে, তবুও না! চুপচাপ শান্তভাবে ব'সে থাকবেন। অবশ্য, যদি সে সরাসরি শকট লক্ষ্য ক'রেই এগিয়ে আসে, তাহ'লে আপনাদের আত্মরক্ষা করতে হবে বৈকি—আপনাদের তো রশ্মিপ্রেরক আছেই…তবে তার দরকার হবে ব'লে মনে হয় না…আর আপনি,' শকটচালককে সে বললে, 'এঁকে দেয়াল থেকে গ্যাসের সিলিণ্ডারগুলো নামাতে সাহায্য করুন, আর আপনি,' এবার সে বললে বেতারচালককে, 'আপনি অনবরত লুনা নিয়ন্ত্রণদপ্তর, নির্মাণশিবির, অন্য শকটগুলো—সবাইকে ডাকতে থাকুন, আর যেই প্রথমে সাড়া দিক না কেন, তাকে বলবেন যে সেটাউর অন্তত একটা শকট ধ্বংস করেছে, সম্ভবত নির্মাণশিবিরেরই কোনো শকট, আর আমাদের শকট থেকে তিনজন তার সন্ধানে বেরিয়ে গেছে। অর্থাৎ আমি চাই না যে কেউ রশ্মিপ্রেরক নিয়ে খেয়ালখুশি মতো এলোমেলো রশ্মি ছুঁড়ুক। বুঝিয়ে বলবেন… আর, চলুন, এবার যাওয়া যাক!'

যেহেতু একেকজনে কেবল একটা ক'রে সিলিণ্ডারই বইতে পারবে, তারা

সবশুদ্ধু চারটে সঙ্গে নিলে। পিরক্স তার সঙ্গীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো, না, 'মড়ার খুলির' ওপরে নয়, বরং সেটা ছাড়িয়ে একটু দূরে, যেখানে ছোট্ট অগভীর একটা খাড়াই উঠে গেছে অববাহিকা থেকে। যদ্দূর সম্ভব যাওয়া যায়, গেলো তারা, একটা মস্ত পাথরের চাঁইয়ের পাশে সিলিণ্ডারগুলো নামিয়ে রাখলো, তারপর পিরক্স শকটচালককে ফিরে যেতে হুকুম দিলে। সে নিজে পাথরের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে অববাহিকার ভেতরটায় দুরবিন চোখে দিয়ে তাকালো। ম্যাকর্ক আর শিক্ষানবিশটি তার পাশেই গুঁড়ি মেরে ব'সে আছে। অনেকক্ষণ পর পিরক্স তাদের বললে :

'তাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, ডক্টর ম্যাকর্ক, সেটাউর যা বলছিলো, সে-সব কথার কি সত্যি কোনো অর্থ আছে?'

'আমার সন্দেহ আছে। কতগুলো এলোমেলো কথা ব'লেই মনে হচ্ছিলো তখন—অনেকটা স্কিৎসোফ্রেনিয়া রোগীর প্রলাপের মতো, কথায় আর কাজে কোনোই সংগতি নেই···'

'ওখানকার ঐ আগুনটা এখন নিভে যাচ্ছে,' বললে পিরক্স।

'রশ্মি ছুঁড়েছিলেন কেন আপনি?' ম্যাকর্ক জিগেশ করলে। 'লোকজন থাকতে পারতো ওখানে।'

'না, কেউ ছিলো না ওখানে।'

পিরক্স তার দুরবিন এক মিলিমিটার ক'রে সরাচ্ছে···রৌদ্রে-ঝলশানো অববাহিকার প্রত্যেকটা ফাটল তন্নতন্ন ক'রে খুঁজছে।

'ওরা লাফিয়ে পড়বারও সময় পায়নি।'

'সেটা কী ক'রে বুঝলেন?'

'কারণ শকটটাকে সে একেবারে দু-দুটো টুকরো ক'রে ফেঁড়ে ফেলেছিলো, এখনও তা দেখতে পারবেন আপনি। ওরা নিশ্চয়ই একেবারে তার মুখোমুখি গিয়ে পড়েছিলো হঠাৎ। মাত্র কয়েক মিনিট দূর থেকে সে রশ্মি ছুঁড়েছিলো। আর, তাছাড়া, শকটের দুটো দরজাই বন্ধ। না,' দু-সেকেণ্ড পরেই সে বললে, 'সে রৌদ্রের মধ্যে নেই। সম্ভবত গোপনে শট্‌কে পড়ার কোনো সুযোগই পায়নি···তার মানে তাকে টেনে বের ক'রে আনতে হবে আমাদের।'

ঝুঁকে সে ভারি সিলিণ্ডারটাকে পাথরের চাঁইয়ের ওপর টেনে তুললো, তারপর নলের মুখটা তার সামনে ঠিকমতো বসিয়ে দাঁতে-দাঁত চেপে বললে :

'একেবারে একটা কাউবয় আর রেডইণ্ডিয়ানদের অবস্থা. ঠিক যার কথা আজীবন স্বপ্নে দেখেছি…'

সিলিণ্ডারটা পিছলে পড়লো ; কোনোরকমে সেটাকে দু-হাতে টেনে ধ'রে, সে পাথরের ওপর চেটালোভাবে শুলো, বললে :

'যদি কোনো নীল ঝলক দ্যাখেন, তক্ষুনি গ্যাস ছুঁড়বেন—ওটাই তার রশ্মিপ্রেরক চোখ…'

পিরক্স গায়ের জোরে ঠেললো সিলিণ্ডারটাকে, আর সেটা প্রথমে আস্তে তারপর ক্রমেই হুড়মুড় ক'রে পাথরের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে গেলো। তিনজনেই তাগ ক'রে রইলো ; সিলিণ্ডারটা প্রায় দুশো মিটার গড়িয়ে নেমেছে, এখন আবার আস্তে গড়াচ্ছে, কারণ ঢালটা ক'মে এসেছে। কয়েকবার মনে হ'লো খোঁচা-খোঁচা পাথরের ধাক্কা লেগে সে থেমে পড়বে, কিন্তু একটা তাদের পাশ দিয়ে গড়গড ক'রে নামলো, ক্রমশ ছোটো থেকে আরো-ছোটো হ'য়ে এলো সে, এখন তাকে দেখাচ্ছে ফ্যাকাশে-উজ্জ্বল একটা ছোটো দাগের মতো, অববাহিকার ঠিক তলদেশে পৌঁছে গেছে প্রায়।

'কিছুই হ'লো না ?' পিরক্স হতাশভাবে বললে। 'হয় আমি যতটা ভেবেছিলুম তার চেয়েও সে ঢের বেশি চৌকশ আর চতুর, আর নয়তো সিলিণ্ডারটায় তার কোনো আগ্রহই নেই। না-হ'লে এতক্ষণে…'

তার কথা শেষ হ'লো না। ঠিক তাদের নিচেই ঢালের ওপর চোখ-ধাঁধানো একটা ঝলক। আগুনের শিখা মুহূর্তের মধ্যে একটা ভারি হলদে-বাদামি মেঘে পরিণত হ'লো, আর ঠিক তার মাঝখানে রাগিভাবে ঝলশে উঠলো আগুন, ক্রমশ পাথরের ফলাগুলোর গায়ে ছড়িয়ে পড়লো।

'ক্লোরিন…' বললে পিরক্স। 'আপনারা ছুঁড়লেন না কেন ? কিছু দেখতে পাননি ?'

'না,' শিক্ষানবিশটি আর ম্যাকর্ক একই সঙ্গে ব'লে উঠলো।

'বেজন্মা ! বদমাশ ! নিশ্চয়ই কোনো ফাটলের মধ্যে লুকিয়ে আছে হতচ্ছাড়া, নয়তো পাশ থেকে রশ্মি ছুঁড়েছে। এখন মনে হচ্ছে এভাবে

হয়তো কোনো সুবিধেই হবে না। তবু চেষ্টা করা যাক।'

দ্বিতীয় একটা সিলিণ্ডার তুলে নিয়ে সে প্রথমটার মতোই পাথরের গা বেয়ে জোরে ঠেলে দিলে। গোড়ায় প্রথমটার মতোই গড়িয়ে নামলো সেটা, কিন্তু ঢাল বেয়ে আদ্ধেক নেমেই সিলিণ্ডারটা উলটে গিয়ে থেমে পড়লো। পিরুক্স তার দিকেই তাকাচ্ছিলো না—তার সব অভিনিবেশ তখন অন্ধকারের সেই তিনকোণা অংশে, যেখানটায়, কোথাও-একজায়গায়, ওঁৎ পেতে আছে সেটাউর। মুহূর্তগুলো কাটলো মন্থর থেকে মন্থরতর বেগে। তারপর অতর্কিতেই ঢালটাকে ফাটিয়ে চুরমার ক'রে দিলে এক বিস্ফোরণ। কোথায় যে রোবোটটা লুকিয়ে আছে, পিরুক্স তা কিছুতেই খুঁজে বার করতে পারলে না, কিন্তু অগ্নিশিখার গতিপথ হঠাৎ তার চোখে পড়েছিলো, আরো স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে বলতে হয় অন্তত তার আংশিক গতিপথ, কারণ প্রথম সিলিণ্ডারের গ্যাসের মেঘের মধ্য দিয়ে যাবার সময় রশ্মিটা হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছিলো জ্বলন্ত সূর্যকরোজ্জ্বল এক সুতোর মতো। যেই সেই জ্বলন্ত গতিরেখা তার চোখে পড়লো—এর মধ্যেই সেটা মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে—আর যেই টেলিফোটো-লেন্সে কাটাকুটি ক'রে গেলো দূরের অন্ধকারের একটা অংশ, সে ঘোড়া টিপলো। ম্যাকর্কও সে-ই মুহূর্তে ঠিক তা-ই করেছিলো, আর পরের মুহূর্তে শিক্ষানবিশটিও তার ঘোড়া টিপেছিলো। অববাহিকার কালো মেঘে যেন সূর্যের তিনটি ঝলক ধারালো ফলা দিয়ে চ'ষে গেলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে, যেন কোনো অতিকায় জ্বলন্ত ডালা শব্দ ক'রে আছড়ে পড়লো তাদের সামনে—যে-পাথরটা তাদের আড়াল ক'রে রেখেছিলো সেটা থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো, আর তার কিনার থেকে বৃষ্টির মতো ঝ'রে পড়লো হাজার-হাজার রামধনুর ফুলঝুরি, আর জ্বলন্ত পাথরের টুকরো তাদের পোশাকে শিরস্ত্রাণে ছিটকে পড়লো—আর পড়তে-না-পড়তেই যেন চোখের জলের ছোট্ট-ছোট্ট ফোঁটার মতো জ'মে গেলো। তারা এখন পাথরের ছায়ায় গা মিশিয়ে শুয়ে আছে, আর তাদের মাথার ওপর শপাং-শপাং ক'রে হাওয়া ছিঁড়ে দিলে তপ্তশ্বেত এক তরোয়াল, তারপর আরেকটা, তারপরে আরো-একটা, পাথরের গা ছ'ড়ে গেলো তৃতীয়টা, আর পাথরটাকে মুহূর্তে ঢেকে দিলে রাশি-রাশি স্ফটিককণার বুদ্বুদ।

'সবাই ঠিক আছেন তো?' মাথা না-তুলেই জিগেশ করলে পিরুক্স।

'হ্যাঁ !'—'আমিও !' এলো উত্তরগুলো।

'শকটে চ'লে যাও তুমি, বেতারচালককে বলো সবাইকে ডেকে এখানে আসতে বলতে, কারণ আমরা ওকে এখানে পেয়েছি, চেষ্টা করবো যতক্ষণ পারা যায় এখানেই ওকে ব্যস্ত রাখতে,' পির্‌ক্স বললে শিক্ষানবিশটিকে। সে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে চললো, তারপর একটু দূরে গিয়েই মাথা নুইয়ে সোজা ছুটে গেলো পাথরগুলোর দিকে, যার আড়ালে শকটটা দাঁড়িয়ে ছিলো।

'আরো দুটো সিলিণ্ডার আছে আমাদের, ডক্টর, দুজনেরই একটা ক'রে—আসুন, এবার জায়গা বদল করি দুজনে। আর, সাবধান, কিছুতেই মাথা তুলবেন না, সে কিন্তু এরই মধ্যে একবার ঠিক আমাদের মাথার ওপর তাগ ক'রে রশ্মি ছুঁড়েছে…'

এই ব'লে পির্‌ক্স একটা সিলিণ্ডার তুলে নিলে হাতে, তারপর বড়ো-বড়ো কয়েকটা পাথরের টুকরোর ছায়ার সুযোগ নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে এগিয়ে গেলো। প্রায় দুশো পা এগিয়ে তারা একটা জমাট লাভার বাঁধের আড়ালে আশ্রয় নিলে। শিক্ষানবিশটি শকট থেকে ফিরে এসে গোড়ায় তাদের দেখতে পায়নি। হাঁপাচ্ছিলো সে, যেন এক মাইল রাস্তা দম-না-ফেলেই ছুটে এসেছে।

'সময় নাও—সহজ হ'য়ে নাও!' বললে পির্‌ক্স। 'আর, হ্যাঁ, ওখানকার কী খবর ?'

'বেতার-সংযোগ ঘটানো আবার সম্ভব হয়েছে…' শিক্ষানবিশটি পির্‌ক্সের পাশে উবু হ'য়ে বসলো ; তার শিরস্ত্রাণের কাচের মধ্য দিয়ে পির্‌ক্স দেখতে পেলে তার চোখ পিটপিট করছে। 'ঐ শকটটায়—যেটা ধ্বংস হয়েছে—নির্মাণশিবিরের চারজন লোক ছিলো। ওদের দ্বিতীয় শকটটা নিশ্চয়ই ফিরে গিয়েছে, কারণ তার রশ্মিপ্রক্ষেপ যন্ত্রটায় গণ্ডগোল ছিলো…আর বাকিগুলো শুধু এ-পাশ ও-পাশ দিয়ে গেছে, কিছুই তারা দেখতে পায়নি…' পির্‌ক্স মাথা নাড়লে, ভঙ্গিটা এমন, যেন বলতে চাচ্ছে : 'আমিও তা-ই ভেবেছিলুম।'

'আর কী খবর ? আমাদের দলের কী হয়েছে ?'

'তাদের প্রায় সকলেই এখান থেকে অন্তত কুড়ি মাইল দূরে গিয়ে পড়েছিলো। সেখান থেকে একটা মিথ্যে বিপদসংকেত এসেছিলো, কোন-এক হাউই-চড়া সন্ধানকারী জানিয়েছিলো যে সেটাউরকে দেখতে পেয়েছে, অমনি সবাই সেখানে চ'লে গিয়েছিলো। শুধু তিনটি শকট থেকে এখনো কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।'

'এখানে তারা কখন এসে পৌঁছুবে ?'

'এই মুহূর্তে আমরা কেবল ওদের খবরই পাচ্ছিলুম…' শিক্ষানবিশটি একটু বিব্রতভাবে বললে।

'শুধু ওদের খবর পাচ্ছিলুম ? তার মানে ? !'

'বেতারচালকের মতে হয় প্রেরকযন্ত্রে কোনো বিচ্ছিরি গণ্ডগোল হয়েছে, আর নয়তো এই জায়গায় এমন-একটা কিছু আছে যাতে তার পাঠানো সব বার্তাই চাপা প'ড়ে যাচ্ছে। সে জানতে চেয়েছে অন্য-কোথাও স'রে গিয়ে শকটটা রাখা যাবে কি না, তাহ'লে সে পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারবে আসলে কী ব্যাপার…'

'যদি একান্তই দরকার হয়, তাহ'লে স'রে যেতে হবে বৈকি !' পির্ক্স উত্তর দিলে। 'আর, হ্যাঁ, ওভাবে ছুটো না ! কোথায় পা সেটা পড়ছে একটু খেয়াল রেখো।'

কিন্তু শেষ কথাগুলো বোধহয় তার কানে আদৌ পৌঁছোয়ইনি, কারণ সে তখন আগের মতোই তুমুল ছুট লাগিয়েছে।

'খুব তাড়াতাড়ি হ'লেও আধ ঘণ্টা লাগবে তাদের আসতে, অবিশ্যি যদি আমরা বেতারযোগাযোগ করতে পারি,' পির্ক্স মন্তব্য করলে। ম্যাকর্ক কোনো কথা বললে না। পরের চালটা কী হবে, পির্ক্স তাই ভাবতে শুরু করলে। তারা কি অপেক্ষা করবে, না অন্যকিছু ? অববাহিকায় পরের পর শকট ঝটিকাবাহিনীর মতো নেমে পড়লে হয়তো সাফল্য অনিবার্য, কিন্তু ক্ষয়ক্ষতিও নেহাৎ কম হবে না। সেটাউরের তুলনায় তাদের শকটগুলো অনেক বড়ো চাঁদমারি, তাছাড়া সেটাউরের মতো অত ক্ষিপ্রও তারা নয়, আর সবাই যদি একসঙ্গে আঘাত হানতে না-পারে, যদি নিছকই দ্বৈরথ সমর হয়, তাহ'লে এক-এক ক'রে সবগুলো

শকটের দশাই হবে নির্মাণশিবিরের ঐ শকটের মতো। সেটাউরকে ফাঁকায় আলোর মধ্যে বার ক'রে আনবার কোনো উপায় আছে কিনা, তা-ই সে ভাববার চেষ্টা করলে। যদি টোপ হিশেবে একটা শকট পাঠানো যায়, যাতে কোনো লোক নেই, আর যেটাকে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তারপর যদি অন্য-কোনোখান থেকে রোবোটটাকে আঘাত হানা যায়, যদি এমনকী ওপর থেকে···

হঠাৎ তার মনে হ'লো, সত্যি-তো, তার তো অপেক্ষা করার মোটেই দরকার নেই, তার হাতে তো এখুনি একটা শকট আছে! কিন্তু তবু কেন যেন পরিকল্পনাটা তার তেমন কাজের ঠেকলো না। অন্ধের মতো একটা শকটকে ওভাবে পাঠিয়ে দেয়াটা কোনোই কাজের কথা নয়। সেটাউর শুধু অবলীলাক্রমে সেটা টুকরো টুকরো ক'রে ফাটিয়ে দেবে। সে কি জানে, সে কি বুঝতে পেরেছে যে ঐ ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ব'লেই সে এমন চমৎকার সুযোগ পেয়েছে? কিন্তু এভাবেই তো রোবোটটাকে বানানো হয়েছে, সব অসুবিধের মধ্যেও যাতে মাথা খাটিয়ে কৌশল ক'রে কাজ করতে পারে···তার এই পাগলামির মধ্যেও স্পষ্ট একটা শৃঙ্খলা আছে, একটা নিয়ম আছে, হ্যাঁ, কিন্তু কী সেই নিয়মশৃঙ্খলা? তারা সেই পাথুরে লাভার স্তূপের আড়ালে নিবিড় শীতল ছায়ার মধ্যে ঝুঁকে ব'সে রইলো। হঠাৎ পির্‌ক্সের মনে হ'লো সে একটা গবেট, একটা জ্বলজ্যান্ত হাঁদা।

সে নিজে যদি সেটাউর হ'তো, তাহ'লে সে কী করতো?

আর তক্ষুনি আতঙ্কে তার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো, কারণ সে ঠিক জানে যে—সে যদি সেটাউর হ'তো, এই অবস্থায় পড়তো—তাহ'লে সে-ই সোজাসুজি আক্রমণ করতো। চুপচাপ কিছু ঘটবার অপেক্ষায় ব'সে থেকে তার কোনোই লাভ হ'তো না। কাজেই, সে কি তবে, এখন, গুড়ি-গুড়ি তাদের দিকেই এগুচ্ছে! এমনকী, এখন, এই মুহূর্তে? এগুচ্ছে কি? সারাক্ষণ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কেউ চেষ্টা করলে পশ্চিমের ঐ টিলাটায় গিয়ে কোনোরকমে পৌঁছুতে পারে, আর তার আরো ওপাশে ঐ যে এতগুলো মস্ত-মস্ত পাথরের চাঁই আছে, লাভাস্তরের চিড়-ধরা ফাটল-ধরা জটিল বিন্যাস, ঐ গোলকধাঁধায় যে-কেউ ইচ্ছে করলে অনন্তকাল লুকিয়ে থাকতে পারে···

এখন তার আর কোনো সন্দেহই নেই যে সেটাউর ঠিক এভাবেই

এগুবে : যে-কোনো মুহূর্তে এখন তাকে প্রত্যাশা করতে পারে তারা।

'ডক্টর, আমার আশঙ্কা যে সে অতর্কিতে আমাদের ওপর এসে চড়াও হবে!' লাফিয়ে উঠলো পির্‌ক্স। 'আপনার কী মনে হয়?'

'আপনার ধারণা যে লুকিয়ে এসে সে আমাদের ওপর হানা দেবে?' ম্যাকর্ক মৃদু হাসলো। 'হ্যাঁ, আমারও তা-ই মনে হয়েছে। সেটাই একমাত্র যুক্তিসংগত পথ, অকাট্য যুক্তির পথ। কিন্তু সে কি সত্যি কোনো যুক্তি মেনে চলবে? সেটাই একমাত্র প্রশ্ন...'

'আমরা তাহ'লে আর-একবার চেষ্টা ক'রে দেখি,' পির্‌ক্স দাঁতে-দাঁত চেপে বললে। 'এই সিলিণ্ডার দুটো ঢাল বেয়ে গড়িয়ে দিয়ে দেখতে পারি সে কী করে...'

'বুঝলুম। এক্ষুনি?...'

'হ্যাঁ। আর সাবধান!'

ওপরে টেনে তুললো তারা সিলিণ্ডার দুটো, চেষ্টা করলো যাতে আড়ালে থাকে, অববাহিকার তল থেকে কিছুতেই যাতে তারা কারু নজরে না-পড়ে, তারপর ধাতুর তৈরি সিলিণ্ডার দুটোকে প্রায় একই সঙ্গে গড়িয়ে ঠেলে দিলে তারা। বাতাস নেই ব'লে তারা শুনতেই পেলে না সিলিণ্ডার দুটো ঠিকমতো গড়িয়ে যাচ্ছে কি না, কিংবা কোন দিকটায় গড়াচ্ছে। পির্‌ক্স ততক্ষণ তার মনস্থির ক'রে ফেলেছে। অদ্ভুত ন্যাংটো লাগছে তার নিজেকে, একেবারেই উলঙ্গ, যেন তার মাথার চারপাশে কোনো শিরস্ত্রাণ নেই কিংবা তার শরীর ঘিরে তিনপল্লা পুরু কোনো পোশাক নেই—সে পাথরের গায়ে গা চেপে সাবধানে মুখ বার ক'রে তাকালে।

কিছুই বদলায়নি নিচে। শুধু সেই ভাঙাচোরা শকটটাকে এখন আর চোখে পড়ছে না, কারণ আগুন নিভে যাবার পর তার টুকরোগুলোও আশপাশের অন্ধকারের মধ্যে ঢাকা প'ড়ে গিয়েছে। সেই একই জায়গায় অধিষ্ঠান ক'রে আছে অন্ধকার, একটা অসমান প্রলম্বিত ত্রিভুজের ছায়া, তার ভিত্তিটা পশ্চিমের শিলাশ্রেণীর গায়ে জড়ানো। একটা সিলিণ্ডার তার প্রায় একশো ফুট নিচে গিয়ে থেমেছে—একটা পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে লম্বালম্বি থেমে পড়েছে। অন্যটা এখনো গড়িয়ে নামছে, মন্থর-গতিতে, ক্রমেই ছোটো হ'য়ে এলো সে চোখের সামনে, তারপর একেবারে

থেমে গেলো। কিছুই যে ঘটলো না, এটা মোটেই পির্‌ক্সের পছন্দ হ'লো না। 'ও বোকা নয়,' সে ভাবলে, 'তার নাকের ডগার সামনে কোনো চাঁদমারি ছুঁড়ে দিলে সে রশ্মি ছুঁড়বে না।' মাত্র দশ মিনিট আগে, ঠিক কোন জায়গা থেকে সেটাউর তার নীল চোখ দেখিয়ে তার অবস্থান ফাঁস ক'রে দিয়েছিলো, সে-জায়গাটা সে খুঁজে দেখবার চেষ্টা করলে: কিন্তু কাজটা প্রায় অসাধ্য।

'হয়তো ঐ জায়গাতেই সে নেই আর,' ভাবলে পির্‌ক্স। 'হয়তো সে সোজা উত্তর দিকে পেছিয়ে যাচ্ছে, কিংবা অববাহিকার তলদেশ দিয়ে সমান্তরভাবে চলেছে, অথবা ঐ চুম্বকেভরা লাভাস্তূপের পাশ দিয়ে চলেছে হয়তো...যদি সে একবার চুড়োর ঐ গোলকধাঁধায় গিয়ে পৌঁছোয়, তাহ'লে তাকে আমরা চিরকালের মতো হারাবো...'

আস্তে, হাৎড়ে-হাৎড়ে, সে তার রশ্মিপ্রেক্ষপ যন্ত্রের বাঁটটা তুললো। তারপর পেশীগুলো ঢিলে ক'রে দিয়ে বললে, 'ডক্টর ম্যাকর্ক! এদিকে একটু আসবেন?'

ম্যাকর্ক যখন তার পাশে এসে হাজির হ'লো, সে বললে:

'ঐ সিলিণ্ডার দুটো দেখতে পাচ্ছেন? একটা ঐ সামনেই আছে, আমাদের ঠিক তলায়, অন্যটা আরো-একটু দূরে···'

'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।'

'প্রথমে কাছেরটাকে লক্ষ্য ক'রে রশ্মি ছুঁড়ুন, তারপরে অন্যটাকে তাগ ক'রে···ধরুন, চল্লিশ সেকেণ্ড বিরতি দেবেন দুটোর মধ্যে···কিন্তু এখান থেকে নয়!' চট ক'রে সে জুড়ে দিলে। 'এর চেয়ে ভালো একটা জায়গা চাই।' হাত তুলে দেখালো সে। 'ওটা মোটেই মন্দ জায়গা নয়, ঐ গর্তটার মধ্যে। রশ্মি ছুঁড়েই হামাগুড়ি দিয়ে ওটার মধ্যে ঢুকে পড়বেন। ঠিক আছে?'

ম্যাকর্ক কোনো প্রশ্ন করলে না। তক্ষুনি, নিচু হ'য়ে, সে নির্দেশিত জায়গাটার দিকে চললো। অধীরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলো পির্‌ক্স। সেটাউর যদি একটুও মানুষের মতো হয়, তাহ'লে তাকে কৌতূহলী হ'তেই হবে। সব বুদ্ধিমান প্রাণীই কৌতূহলী—আর কৌতূহল কাউকে উশকে তোলে তখনই যখন কোনো দুর্বোধ্য ঘটনা ঘটে···ডক্টর ম্যাকর্ককে এখন আর সে

দেখতে পাচ্ছে না। সে জোর ক'রে সিলিণ্ডার দুটো থেকে চোখ সরিয়ে আনলে, ম্যাকর্কের ছোঁড়া রশ্মির আঘাতে সে দুটো এখুনি ফেটে পড়বে; সে তার সমস্ত অভিনিবেশ, একাগ্রভাবে, শুধু সেই ছায়ার পাশের রৌদ্রোজ্জ্বল আবর্জনাস্তূপে এঁটে রাখলো। দূরবিন চোখে এঁটে লাভা-প্রবাহের ঠিক সেই অংশটার দিকে তাকালে সে। পরকলার মধ্যে কিম্ভূত সব উদ্ভট মূর্তি এক-এক ক'রে সার বেঁধে দেখা দিলো, যেন কোনো নির্বস্তুক শিল্পরীতিতে অভ্যস্ত কোনো ভাস্করের চিত্রশালা: স্ক্রুর মতো পেঁচিয়ে-ওঠা পাথরের ফলা, সরীসৃপের মতো কিলবিলে চিড়-ধরা লাভার পাত—প্রোজ্জ্বল জমি আর আঁকাবাঁকা ছায়ার এই অদ্ভুত খিচুড়ি চোখের ওপর কেমন একটা বিশ্রী অনুভূতি ছড়িয়ে দেয়। আর তার দৃষ্টির শেষ সীমায়, তার অনেক নিচে, ঢালের গায়ে, একটা তুলকালাম বিস্ফারিত ঝলক। দীর্ঘ বিরতির পর দ্বিতীয় আরেকটা। সব চুপচাপ। শুধু শিরস্ত্রাণের ভেতর তার মাথার মধ্যেটা দপদপ করছে, যেন সূর্য চেষ্টা করছে শিরস্ত্রাণ ফুঁড়ে তার মাথার খুলির মধ্যে ঢুকে পড়তে। বিশৃঙ্খলভাবে জড়াজড়ি-করা একদঙ্গল লাভা-পাথরের ওপর সে দূরবিন বুলিয়ে গেলো।

কী যেন ন'ড়ে উঠলো। আর পির্‌ক্স জমাট বেঁধে গেলো।

একটা অতিকায় পাথরে-তৈরি কুঠারের ভাঙা ফলার মতো একটা শিলাখণ্ডের ক্ষুরের ধারের মতো চুড়োর ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে অর্ধবর্তুল এক অবয়ব, তার গায়ের রং কালো কষ্টিপাথরের মতো, কিন্তু এ পাথর নয়, এর হাত আছে, দু-দিক থেকে সে চেপে ধরেছে শিলাখণ্ডকে। এবার পির্‌ক্স তাকে দেখতে পেলে—তার শরীরের ওপর-অর্ধেক। মোটেই কবন্ধ দেখাচ্ছে না তাকে, বরং হুবহু মানুষের মতোই দেখতে, যেন কোনো আফ্রিকার জাদুকর দাঁড়িয়ে আছে মুখোশ প'রে—এমন-এক মুখোশ যা তার মুখ, গ্রীবা, বুক ঢেকে আছে, এমন চ্যাপটা যে অদ্ভুত দেখাচ্ছে, কেমন যেন অতিপ্রাকৃত, দানবিক…তার ডান বাহুর কনুই দিয়ে সে তার রশ্মিপ্রেরক যন্ত্রের বাঁটটা স্পর্শ করলে, কিন্তু স্বপ্নেও এখন সে রশ্মি ছোঁড়বার কথা ভাবলে না। ঝুঁকিটা বড্ড বেশি হবে—এত দূর থেকে এই দুর্বল অস্ত্র দিয়ে তাকে

ঘা দেবার সম্ভাবনাটা অত্যন্ত কম। আর অন্যজন, নিশ্চল, অটল, তার যেটা মাথা সেটা বাড়িয়ে দিয়ে নিরীক্ষণ করছে দৃশ্যটা : তার ধড়ের ওপর মাথাটা অল্প উঠে আছে : দুই গ্যাসভরা মেঘ ঢাল বেয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে আস্তে, অসহায়ভাবে ভেসে যাচ্ছে শূন্যে। বেশ কিছুক্ষণ কাটলো এইভাবে। মনে হ'লো সেটাউর যেন মোটেই বুঝতে পারেনি কী ঘটেছে, আর তাই কেমন হতভম্ব হ'য়ে পড়েছে, কী করা উচিত সেটা ঠিক ধরতে পারছে না।

তার সেই দ্বিধা, তার সেই ইতস্তত ভাব পির্‌ক্স পুরোপুরি অনুভব করতে পারলে : সব এত অদ্ভুত চেনা, এত অন্তরঙ্গ, এত মানবিক যে পির্‌ক্সের গলার কাছটায় দলা পাকিয়ে ব্যথা করলো।

কী করতুম আমি ওর জায়গায়, কী ভাবতুম ?

যে-আমি যে-সব জিনিশ তাগ ক'রে আগে রশ্মি ছুঁড়েছি, এখন আর-কেউ কিনা ঠিক তাদেরই লক্ষ্য ক'রে রশ্মি ছুঁড়ছে ; আর তাই, এই অন্যজন, সে নিশ্চয়ই প্রতিপক্ষ নয়, কোনো শত্রু নয়, বরং নিশ্চয়ই কোনো হঠাৎ-আসা অচেনা বন্ধু।

কিন্তু আমি হ'লে তো ঠিকই জানতুম যে আমার কোনোই বন্ধু নেই, চেনা বা অচেনা। কিন্তু, যদি ঐ অচেনা যদি আমারই মতো কেউ হয় ? তখন ?

অন্যজন যেন সাড় ফিরে পেলে। অবলীলাক্রমে নড়লো সে, অসাধারণ তার ক্ষিপ্রতা। আর তখুনি পুরো উদ্ভাসিত হ'লো সে চোখের সামনে, সেই উত্তল পাথরের ওপর সটান, যেন এখনও কোনো সজ্ঞান প্রাণী ঐ রহস্যময় বিস্ফোরণ দুটোর কারণ হাৎড়ে বেড়াচ্ছে। তারপর সে ঘুরে দাঁড়ালো, লাফিয়ে নেমে পড়লো পাথর থেকে, সামনের দিকে একটু হেলে শুরু করলো ছুটতে—মাঝে-মাঝে পির্‌ক্সের দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে সে, কিন্তু আবার দেখা দিচ্ছে পরক্ষণেই, কখনোই দু-এক সেকেণ্ডের বেশি চোখের আড়াল থাকছে না, সেই লাভান্তরের গোলকধাঁধায় রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলার মধ্যে সেও যেন কোনো অংশ নিয়েছে হঠাৎ। আর এইভাবে ক্রমেই সে এগিয়ে আসছে পির্‌ক্সের কাছে, যদিও সারা সময় অববাহিকার তলা দিয়েই সে ছুটছে। এখন শুধু ঢালুটার ব্যবধান আছে দু-জনের মধ্যে আর পির্‌ক্স এখন রশ্মি ছুঁড়বে কি না এই ভাবনাটাকে মনের মধ্যে নেড়ে-চেড়ে দেখছে। কিন্তু আলোর সেই চিলতে সরু ফালির মধ্যে ঝিলিক মেরে উঠছে

সে, আর পরক্ষণেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে—আর যেহেতু তাকে অবিশ্রাম এঁকেবেঁকে এগুতে হচ্ছে, পাথর আর জঞ্জালের স্তূপের মধ্যে দিয়ে পথ ক'রে-করে, এটা বোঝা মুশকিল তার হাত দুটো কোথায় আর কোথায়ই বা শরীর—কারণ সে ছুটছে কোনো মানুষের মতো, হাত দুটি নেড়ে ভারসাম্য বজায় রেখে—বোঝা যাচ্ছে না কোনখানে পলকের জন্য ঝলশে উঠবে তার কবন্ধ ধড়, ধাতু থেকে রৌদ্রের ফলা ছিটিয়ে, আর কোনখানেই বা আবার অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। হঠাৎ সেই রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি ছিঁড়ে ছুটে গেলো বিদ্যুতের এক শিখা, সেটাউর যেখান দিয়ে ছুটছিলো সেখানে ছিটিয়ে দিলো ফুলঝুরি আর জ্বলন্ত শিখার উড়ন্ত পুচ্ছ। কে ছুঁড়েছে এই রশ্মি? ম্যাকর্ককে দেখতে পাচ্ছিলো না পির্‌ক্স, কিন্তু আগুনের শিখা ছুটে এসেছে অন্যদিক থেকে—অর্থাৎ এ শুধু সেই শিক্ষানবিশটি, সেই হাঁদা ছোকরাটি, গবেট, উজবুক, আহাম্মক! পির্‌ক্স অভিশাপ দিলে তাকে, রেগে টং হ'য়ে গেলো, কারণ কোনো লাভই হয়নি এতে, বলাই বাহুল্য—ধাতুরচিত সেই গম্বুজ শুধু আরেকবার ঝিলিক দিয়ে উঠলো, আর তারপরেই একেবারে মিলিয়ে গেলো। 'আর শুধু তাই নয়, ও কিনা পেছন থেকে রশ্মি ছুঁড়েছে!' প্রচণ্ড রাগের মধ্যে ভাবলে পির্‌ক্স, তার তিরস্কার যে কতটা উদ্ভট, তা তার আদপেই খেয়াল হ'লো না। আর সেটাউর—সে কিন্তু উলটে রশ্মি ছোঁড়েনি। কেন? শুধু একঝলক তাকে দেখতে চাইলো পির্‌ক্স—কিন্তু না, সে উধাও। ঢালের ঐ পাথরটা কি আড়াল ক'রে রেখেছে তবে? খুবই সম্ভব…সেক্ষেত্রে সে নিজে এখন নিরাপদে নড়তে পারবে…পির্‌ক্স তার পাথরটা থেকে নেমে পড়লো। নিচে থেকে কেউই আর এখন তার ওপর নজর রাখছে না। পির্ক্স ছুটলো, একটু সামনের দিকে হেলে, কিনার ঘেঁষে, পেরিয়ে গেলো শিক্ষানবিশটিকে, সে উপুড় হ'য়ে শুয়ে আছে রশ্মিপ্রক্ষেপ তাগ ক'রে—পা দুটো ছড়ানো, পাথরের গায়ে ঠেকানো—পেছন থেকে তার পাছায় একটা লাথি মারবার অযৌক্তিক ইচ্ছে হ'লো পির্ক্সের, কী-রকম বেঢপ উঁচু হ'য়ে আছে তার পাছাটা সেই বেখাপ্পা পোশাকটার জন্য। গতি ধীর ক'রে দিলে পির্ক্স, শুধু চেঁচিয়ে এই কথা বলবার জন্যে:

'খবরদার, আর রশ্মি ছুঁড়ো না! শুনতে পাচ্ছো আমার কথা?

নামিয়ে রাখো ঐ রশ্মিপ্রক্ষেপ !'

শিক্ষানবিশটি পাশ ফিরে হতভম্ব ভাবে আশপাশে তাকাবার আগেই—কারণ কথাটা তার কানে গেছে শিরস্ত্রাণের মধ্যে লাগানো গ্রাহকযন্ত্র থেকে, কোথায় যে তার উৎপত্তি, তা বোঝবার কোনো সুযোগই দেয়নি তাকে—পিরক্স ছুটে গিয়েছে সামনে : অহেতুক মূল্যবান সময় নষ্ট করবার কথা ভেবে সে ব্যাকুল : যত দ্রুত পারে সে ছুটে চললো, আর তারপরেই সে এসে পৌঁছুলো একটা চওড়া ফাটলের কাছে, আর হঠাৎ পুরো অববাহিকাটা সেই ফোকর দিয়ে তার চোখের সামনে উন্মোচিত হ'য়ে গেলো।

একটা পরিখার মতো দেখাচ্ছে জায়গাটা, একটা খাতের মতো—এত পুরোনো যে বাঁধের ধারগুলো তাদের তীক্ষ্ণতা হারিয়ে ভেঙেচুরে গেছে ; মাটি খ'য়ে-খ'য়ে তৈরি-হওয়া কোনো গিরিখাতের মতোই দেখাচ্ছে। সেটাউরকে সে দেখতে পেলে না, কিন্তু এখান থেকে হয়তো তাকে দেখবার কোনো উপায়ই নেই। আর তাই সে খাতের মধ্যে এগিয়ে এলো, হাতে রশ্মিপ্রক্ষেপ বাগিয়ে-ধরা, উঁচনো ; এটা সে জানে যে সে যা করছে তা পাগলামো, অথচ তবু তার ভেতরের তাড়াটাকে সে ঠেকাতে পারলে না—যেন কোনো-এক অপ্রতিরোধ্য তাগিদ কাজ ক'রে যাচ্ছে তার ভেতরে। নিজেকে সে এই বোঝালে যে সে শুধু একবার দেখতে চাচ্ছে তাকে, যে সে ঐ শেষ পাথরগুলোর কাছে গিয়েই থেমে পড়বে, যার তলায় সেই আবর্জনাস্তূপের পুরো গোলকধাঁধাটা তার চোখের সামনে উন্মোচিত হ'য়ে পড়বে। আর হয়তো, সামনের দিকে মাথাটা হেলিয়ে সে যখন ছুটলো, পায়ের তলা থেকে যখন নুড়ি-পাথর তার চলার বেগে ছিটকে-ছিটকে যাচ্ছে, সে হয়তো সত্যি-সত্যি বিশ্বাস ক'রে বসলো তার এই ভাবনাকে। কিন্তু আসলে কিছুই ভাবছিলো না সে। সে এখন চাঁদের ওপর, অর্থাৎ তার ওজন সবশুদ্ধ পনেরো কিলোগ্রামও হবে কি না সন্দেহ, কিন্তু তবু ক্রমবর্ধমান এই কোনাকুনি রাস্তার হোঁচট খাচ্ছে সে, সে ছুটছে লাফিয়ে-লাফিয়ে, একেক ধাক্কায় আট মিটার ; এর মধ্যেই সে পেরিয়ে এসেছে ঢালের অর্ধেকটা, খাত শেষ হয়েছে অগভীর এক পায়েচলার পথে—আর সেখানে রৌদ্রে ঝলশে উঠেছে লাভাপ্রবাহের প্রথম স্তূপটি, দূরের দিকটা কালো, ডান দিকে, প্রায় একশো মিটার নিচে, ঝকমকে। 'এসে পৌঁছেছি

তবে শেষ পর্যন্ত,' সে ভাবলে। এখান থেকে প্রায় হাত বাড়িয়ে যেন ছোঁয়া যাবে জায়গাটা—যেখানে সেটাউর ঘুরে বেড়াচ্ছে মুক্ত, স্বাধীন, অপ্রতিহত। তাড়াতাড়ি ডাইনে-বাঁয়ে চোখ বুলিয়ে নিলে সে। কেউ নেই, সে দাঁড়িয়ে আছে একা; তার মাথার ওপর খাড়া উঠে গেছে শিলা-স্তরের বিন্যাস, মিশকালো আকাশের তলায় পাথরের এক শূন্য-ছোঁয়া কোলাহল। আগে, সে ওপর থেকে তাকিয়ে, নানা পাথরের মধ্যকার সংকীর্ণ জায়গাগুলো দেখতে পাচ্ছিলো, ওপর থেকে তাকিয়ে পাখি যেমন ক'রে দ্যাখে; কিন্তু এখন কাছের পাথরের স্তূপ এই কাটাকুটি-করা ফাটলের গোলকধাঁধাকে আড়াল ক'রে দিয়েছে। 'না, কোনো লাভ নেই,' সে ভাবলে, 'বরং ফিরেই যাই।' কিন্তু জানে না কেন, তবু এটা সে নিশ্চিতই জানে যে ফিরে সে কিছুতেই যাবে না।

ফিরে না-ই বা গেলো, তবু এখানে এমনিভাবে দাঁড়িয়ে-থাকা কিছুতেই চলে না। আরো-কয়েক পা নিচেই লাভাস্তরের এক নিঃসঙ্গ স্তূপ, টোরিসেল্লির পা ছোঁবে ব'লে একদিন যে লেলিহান লকলকে জ্বলন্ত লাল জিহ্বা বেরিয়েছিলো জ্বালামুখ থেকে, স্পষ্টতই এটা তার শেষ ওগরানো বমি, যা শেষ অব্দি এই খাতে এসে জমাট বেঁধে গিয়েছে। এটাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো আড়াল। এক লাফে তার কাছে গিয়ে পৌঁছুলো সে—যদিও এই প্রলম্বিত চান্দ্র লাফ ঝাপটা বিশ্রী ঠেকলো তার, এই ধীরমন্থর ভাসমান অবস্থা, যেন স্বপ্নের ঘোরে ঘটছে সবকিছু : এতদিন হ'য়ে গেলো তবু কিছুতেই সে এতে অভ্যস্ত হ'তে পারলো না। এই বাঁকাটেরচা পাথরের আড়ালে গুঁড়ি মেরে ব'সে মুখ বাড়ালে সে, আর সেটাউরকে দেখতে পেলে : সেটাউর বেরিয়ে এলো রুক্ষ সর্পিল দুই পাথরের আড়াল থেকে, তারপর তৃতীয় একটার আড়াল দিয়ে গেলো, তার ধাতুর হাত ঘেঁষটে গেলো পাথর, তারপর থমকে দাঁড়ালো। পিরুক্স তাকে দেখছে একপাশ থেকে, অর্থাৎ তার একটা পাশই আলোকিত, শুধু ডান হাতটাই ঝকঝক করছে রৌদ্রে, তেলচকচকে যন্ত্রের মতো—তার শরীরের বাকি কাঠামোটা ছায়ায় ঢাকা। সে শুধু তার রশ্মিপ্রক্ষেপটা চোখের কাছে তুলে তাগ

করেছে, অমনি অন্যজন, আচমকা কোনো অলুক্ষুণে আশঙ্কায়, অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। সে কি এখনও দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, ছায়ায়, শুধু এক পা পেছিয়ে ঢুকে পড়েছে অন্ধকারে? ছায়া লক্ষ্য ক'রে তাগ-করা তার রশ্মিপ্রক্ষেপ, কিন্তু ঘোড়াটা সে ছুঁলো না। গায়ের পেশীগুলো সে শিথিল ক'রে দিলে, নলটা নেমে এলো। অপেক্ষা করতে লাগলো সে। সেটাউরের কোনো চিহ্নই নেই। রাশি-রাশি নুড়িপাথর ছড়িয়ে আছে ঠিক তার নিচে, সত্যিকার এক গোলকধাঁধা, নরক থেকে উঠিয়ে-আনা, এখানে চিরকাল ধ'রে কেউ লুকোচুরি খেলতে পারে ইচ্ছে করলে—জ্যামিতিক কিন্তু উদ্ভট ভুতুড়ে সব বিন্যাসে ছড়িয়ে আছে লাভার স্ফটিক। 'কোথায় আছে সে এখন?' ভাবলে সে, 'যদি একটা-কোনো শব্দও শোনা যেতো, কিন্তু এই হতচ্ছাড়া চাঁদ, বায়ুহীন, শব্দহীন, যেন সবটাই একটা দুঃস্বপ্ন… আমি নেমে গিয়ে তাকে খুঁজে বার করতে পারি ওখানে।…না, কিছুতেই তা করবো না আমি…সে তো আসলে পাগল, পুরোপুরি উন্মাদ…কিন্তু অন্তত সবকিছু বিবেচনা ক'রে দেখা যায়—এই স্তূপটা আর মাত্র বারো মিটার ছড়িয়ে আছে সামনে—পৃথিবীতে লাগতো সম্ভবত দুটো লাফ। আমি তার তলায় ছায়ায় থাকবো, অদৃশ্য, চোখের আড়ালে, সারাটা পথ হেঁটে যেতে পারবো, সবসময় পাথরের দেয়াল পিঠ বাঁচাবে আমার, আর একসময়-না-একসময় তাকে সরাসরি আসতেই হবে আমার সামনে…' পাথরের সেই গোলকধাঁধায় কিন্তু কিছুই বদলায়নি। পৃথিবীতে সূর্য এতক্ষণে বেশ খানিকটা স'রে যেতো, কিন্তু এখানে দীর্ঘ চান্দ্র দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা একরকম থাকে, সূর্যকে দেখায় যেন একই জায়গায় ঝুলে আছে সবসময়, নিভিয়ে দেয় কাছের সব তারা, অর্থাৎ কালো শূন্যতা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে কমলারঙের এক রশ্মিময় আবছায়া…তার পাথরের আড়াল থেকে অর্ধেক ঝুঁকে বেরুলো সে। কিছু নেই। এবার সব তার বড্ড বিরক্তিকর ঠেকছে। অন্যরা আসছে না কেন? কেন কারু দেখা নেই? ভাবাই যায় না যে এতক্ষণেও বেতার মারফৎ কারু সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করা যায়নি…কিংবা হয়তো তারা তাকে এই আবর্জনাস্তূপ থেকে তাড়িয়ে বের করার মৎলব আঁটছে…পুরু কাচের মধ্যে দিয়ে তার কবজির ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে তাজ্জব হ'য়ে গেলো…ম্যাকর্কের সঙ্গে শেষ কথা বলবার পর সবেমাত্র

তেরো মিনিট কেটেছে।

সে তার ঐ আড়াল ছেড়ে বেরুবে ব'লে ঠিক করেছে এমন সময় এক সঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটলো, আর দুটোই সমান অপ্রত্যাশিত, আচম্বিত। দুই লাভাপ্রবাহের মাঝখানকার পাথরের তোরণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছে দুটি শকট, একটার পরে আরেকটা। এখনও তারা দূরেই আছে, এক কিলোমিটারেরও দূরে, পুরোদমে আসছে তারা, পেছনে ঝেঁটিয়ে তুলছে ধুলোবালির দীর্ঘ ঘূর্ণিতোলা পুচ্ছ। আর ঠিক তারই সঙ্গে-সঙ্গে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে মস্ত দুটি হাত, মানুষের হাতের মতোই দেখতে, তফাৎটা শুধু এই যে ধাতুর দস্তানায় মোড়া, আর হাত দুটিকে অনুসরণ ক'রে—এত ক্ষিপ্রবেগে যে সে পেছিয়ে যাবারও কোনো সময় পেলে না—বেরিয়ে এসেছে সেটাউর স্বয়ং। বড়ো জোর দশ মিটার ব্যবধান তাদের দুজনের মধ্যে। পির্ক্স দেখতে পেলে সেই বিশাল ধড়ের ওপর ফুলে-ওঠা এক ছোটো স্তূপ—সেটাই তার মাথা, প্রবল দুই কাঁধের মধ্যে বসানো আর তাতে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে দৃষ্টিকলের পরকলা, নিশ্চল, অপলক দুই কালো ছড়ানো চোখ, আর তাদের মাঝখানে সেই ভয়ংকর তৃতীয় নয়ন, এখন বুজে আছে, কিন্তু চোখের পাতা খুললেই দেখা দেবে রশ্মিপ্রক্ষেপ নলের নীল ঝলক। এটা ঠিক যে সে নিজে হাতে ধ'রে আছে এক রশ্মি-প্রক্ষেপ যন্ত্র, কিন্তু তার চেয়ে সেটাউরের ক্ষিপ্রতা অনেক বেশি, আর তাছাড়া সে রশ্মিপ্রক্ষেপ তাগ-করারও চেষ্টা করেনি—সে শুধু দাঁড়িয়ে আছে রৌদ্রালোকে, নিশ্চল, হাঁটু বাঁকানো, সেটাউরের অতর্কিত আবির্ভাবে যেমন দাঁড়িয়েছিলো তেমনি, স্থাণু, ধরাপড়া, মূর্তিবৎ: আর তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো: দুই মূর্তি—মানুষের আর যন্ত্রের, দুই মূর্তিই ধাতুর বর্মে আগাগোড়া মোড়া। তারপরেই এক ভীষণ আলো পির্‌ক্সের সামনে পুরো জায়গাটা ফালা-ফালা করে ছিঁড়ে দিলে; আগুনের হলকার ধাক্কায় সে উলটে পড়লো পেছনে, চিৎপাত। আর পড়তে-পড়তেও সংজ্ঞা হারায়নি সে—সেই মুহূর্তটায় শুধু সে বিস্ময় অনুভব করলে, কারণ সে শপথ ক'রে বলতে পারতো যে সেটাউর তাকে লক্ষ্য ক'রে রশ্মি ছোঁড়েনি কারণ প'ড়ে যেতে-যেতেও সে দেখেছিলো তার তৃতীয় নয়ন বোজা—সেই অন্ধ কালো রশ্মিময় চোখ তখনও বোজানো ছিলো।

চিৎপাত পড়েছিলো পির্‌ক্স, কারণ রশ্মির ঝলকটা তার ওপর দিয়ে চ'লে গেলো—স্পষ্ট তাকে তাগ ক'রে ছোঁড়া, কারণ পরের মুহূর্তেই আবার সেই চোখধাঁধানো ঝলক, আর পাথরের সেই সর্পিল ঢালটা অমনি মুহূর্তে ভেঙে টুকরো-টুকরো হ'য়ে গেলো—এতক্ষণ এটাই তাকে আড়াল ক'রে রেখেছিলো। গলন্ত ধাতুর ফোঁটা ঝ'রে পড়লো বৃষ্টির মতো, আর পড়তে-পড়তে বদলে গেলো ঝলমলে এক মাকড়শার জালে। কিন্তু এবার সে বেঁচেছে শুধু এই জন্যেই যে তারা তার মাথাটাকে তাগ করেছিলো, আর সে এখন প'ড়ে আছে চিৎপাত, মাটিতে। প্রথম শকটটা—সে-ই রশ্মি ছুঁড়ছে। গড়িয়ে স'রে গেলো সে একপাশে, আর তারপর দেখতে পেলে সেটাউরের পিঠ: নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে সে, যেন ব্রন্‌জে খোদাই করা, আর দুই ঝলক বেগনি-নীল রশ্মি ছুটলো প্রথম শকটটাকে লক্ষ্য ক'রে। এতদূর থেকেও দেখা গেলো সামনের শকটটা উলটে ডিগবাজি খেয়ে পড়লো; ধুলোর ঝড় উঠলো সেখানে, জ্বলন্ত গ্যাস, আর দ্বিতীয় শকটের সবাই তাতে এতই ধাঁধিয়ে গেলো যে একবারও কোনো রশ্মি ছুঁড়তেই পারলে না। আড়াই মিটার লম্বা সেই বিশাল মূর্তি তারপর আস্তে, কোনো তাড়াহুড়ো না-ক'রে, একবার শুধু তাকালো সেই মাটিতে প'ড়ে-থাকা মানুষটার দিকে, যে কিনা তখনও তার রশ্মিপ্রক্ষেপটা আঁকড়ে ধ'রে আছে। সেটাউর ফিরে তার হাঁটু বাঁকালো একটু, যেখান থেকে এসেছিলো সেখানে লাফিয়ে স'রে যাবে ব'লে, কিন্তু পির্‌ক্স, জবুথবুভাবে, পাশ থেকে, তাকে লক্ষ্য ক'রে রশ্মি ছুঁড়লো—শুধু চেয়েছিলো তার পায়ে মারতে কিন্তু হঠাৎ কনুই মাটিতে ঠেকে কেঁপে গেলো একটু, আর আগুনের এক তীক্ষ্ণধার ছুরি সেই ধাতুর মূর্তির মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেটে ফেঁড়ে চিরে বেরিয়ে গেলো—জ্বলন্ত ধাতুর একটা পাত সশব্দে হুড়মুড় ক'রে গড়িয়ে পড়লো নিচের আবর্জনার স্তূপে।

চুরমার শকটটার আরোহীরা সকলেই বেঁচে গিয়েছিলো, কারু গায়ে কোনো আঁচড় পড়েনি, কারু গায়ে কোনো ফোশকাও পড়েনি, আর পির্‌ক্স জানতে পেরেছিলো—সত্যি-যে, জেনেছিলো অনেক পরে—যে তারা সত্যি-সত্যি তাকে তাগ ক'রেই রশ্মি ছুঁড়েছিলো। কারণ কালো পাথরের পটে কালো

সেটাউর এমনভাবে মিশে গিয়েছিলো যে সে কারু চোখেই পড়েনি। অনভিজ্ঞ গোলন্দাজ এটাও খেয়াল করেনি যে সে হালকা রঙের অ্যালুমিনিয়ামের পোশাক দেখতে পেরেছে। পিরক্স এটা ঠিকই জানে যে পরের রশ্মিটার কবল থেকে কিছুতেই সে বাঁচতে পারতো না। সেটাউরই তাকে বাঁচিয়েছে—কিন্তু সে কি জেনে-শুনে? সে কি বুঝতে পেরেছিলো? 'এই শেষ মুহূর্ত ক-টা নিয়ে কতবার যে সে নাড়াচাড়া করেছে মনের মধ্যে, আর প্রতিবারই একটু-একটু ক'রে দৃঢ় হয়েছে তার বিশ্বাস, যে সেটাউর এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছিলো যেখান থেকে অনায়াসেই বোঝা যায় ঐ রশ্মিগুলোর সত্যিকার চাঁদমারি কে। তার মানে কি তাহ'লে এই দাঁড়ায় যে সেটাউর পিরক্সকে বাঁচাতে চেয়েছিলো? কেউই এ-প্রশ্নের উত্তর জোগাতে পারলে না। বুদ্ধি-বৈদ্যুৎ-বিশারদেরা এটাকে নিছক 'কাকতাল' ব'লে উড়িয়ে দিলে—তবে এই মতের সপক্ষে অবশ্য কেউ কোনো প্রমাণ জোগাতে পারলে না। আগে কখনোই এমনতর কিছু ঘটেনি: নির্মাতাদের বিবরণও এ-রকম কোনো ঘটনার উল্লেখ করেনি। সবাই শুধু বললে যে যা করা উচিত ছিলো পিরক্স শুধু তা-ই করেছে—কিন্তু, পিরক্স, তার মনেই কোনো সন্তোষ নেই। একফোঁটাও না। পরে অনেক বছর পর্যন্ত তার স্মৃতির মধ্যে আঁকা র'য়ে গেলো ছোট্ট সেই দৃশ্যটা যেখানে মৃত্যুর সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রেও সে ফিরে এসেছিলো, অক্ষত, অনাহত, অটুট; অথচ কোনোদিনও জানতে পারবে না সম্পূর্ণ সত্য কী ছিলো—আর তিক্ত বিতিক্ত র'য়ে গেলো এই জ্ঞান যে নিকৃষ্টের মতো, নরাধমের মতো, নৃশংসের মতো পেছন থেকে ছুরি বসিয়ে দিয়েই সে কিনা হত্যা করেছে তার প্রাণদাতাকে।

মুখোশ

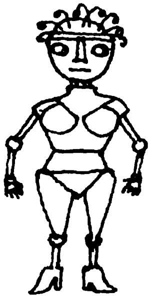

আদিতে ছিলো অন্ধকার আর হিমশিখা আর প্রলম্বিত বাজের শব্দ, আর, ফুলকির দীর্ঘ সুতোর মধ্যে, কয়লার মতো কালো আংটাগুলোর ভেতর, টুকরো-টুকরো আংটার শেকলের ভেতর, আমার মধ্যে ভ'রে দেয়া হ'লো আমিত্ব, বুকে হেঁটে এগিয়ে এলো ধাতুরচিত সব সরীসৃপ, তাদের তুণ্ডের মতো চ্যাপটা মাথা দিয়ে, স্পর্শ করলো সেই জিনিশকে যে কিনা আসলে আমি, আর এইরকম প্রতিটি স্পর্শ সঞ্চারিত ক'রে দিলো বিদ্যুৎঝলকের শিহরন, তীক্ষ্ণ, ধারালো, অথচ প্রায় যেন উপভোগ্যই, উপাদেয়।

গোল জানলার পেছন থেকে চোখগুলো সব লক্ষ করলো আমাকে, অগাধ-গভীর সব চোখ, অনড়, সজাগ, আর পরে স'রে গেলো সেগুলো, পেছিয়ে গেলো, কিন্তু আসলে আমিই হয়তো নড়েছিলুম পর্যবেক্ষণের পরবর্তী বৃত্তের মধ্যে, আর তা জাগিয়ে তুললো কেমন এক ধরনের জড়তা, শ্রদ্ধা আর···আর বেশামাল আতঙ্ক। চিৎপাত প'ড়ে থেকে এই-যে আমার অভিযান, তা যে কতক্ষণ ধ'রে চলেছিলো জানি না; আর যত সময় কাটলো ততই এই যে-জিনিশ 'যে-আসলে-আমি তার বোধ বেড়ে যেতে লাগলো, ক্রমে নিজেকে সে জানতে শিখলো, আবিষ্কার করলো তার নিজের সীমা, আর এটা বলতে পারবো না ঠিক কখন আমি পুরোপুরি ধ'রে নিতে পেরেছিলুম তার/আমার নিজের রূপ, নিজের অবয়ব, নিজের শরীর—এও জানি না কোথায়-কোথায় আমাকে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছিলো, ঠিক, কখন তার প্রত্যেকটা জায়গা চিনতে পেরেছিলুম আমি। তারপর শুরু হ'লো জগৎ, বাজফাটা, শিখাপ্রোজ্জ্বল,

আর অন্ধকার ; আর তারপরেই থেমে গেলো আন্দোলন, আর মুখর সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লঘু কমনীয় আর সৌষ্ঠবে ভরা চলাফেরা—তারাই 'আমাকে' আমার হাতে তুলে দিলো—হালকাভাবে তুলে ধরলো আমাকে, আমাকে ছেড়ে দিলো সাঁড়াশির মতো হাতের কাছে, আর চাপটা মুখগুলোর কাছে বিলিয়ে দিলো অকৃপণ, ফুলকির ফুলঝুরির ভেতর, তারপর অদৃশ্য হ'য়ে গেলো ; আর সেই জিনিশ, যে আসলে 'আমি', তখনও প'ড়ে রইলো অসাড়, যদিও এখন তার নিজের চলাফেরার ক্ষমতা আছে তবু এই বোধটাও পুরোপুরি আছে যে 'আমার' সময় এখনো আসেনি, আর এই অবশ উৎরাই—কারণ আমি, সে, অথবা নিছক 'আমিই', তখন এক ঢালু জমিতে শুয়ে আছি—বিদ্যুৎলহরীর শেষ প্রবাহ, রুদ্ধশ্বাস সব শেষ অনুষ্ঠান, একটা শিহরনজাগানো চুম্বন, টান-টান ক'রে দিলো আমাকে, আর লাফিয়ে উঠে পড়ার সেটাই ছিলো সংকেত, ছিলো অন্ধকারে নিরালোকে সেই গোল মুখের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ার নির্দেশ, অন্য-কোনো তাড়া বা উৎসাহের আর দরকার হ'লো না এখন, আমি স্পর্শ করলুম হিম, মসৃণ, অবতল পাতাগুলোকে, পাথরের কারুকাজের সঙ্গে-সঙ্গে তাদের ওপর আয়েশ ক'রে শুয়ে-পড়ার জন্য। কিন্তু সবকিছুই হয়তো নিছকই কোনো স্বপ্ন।

জাগরণের কিছুই আমার জানা নেই। আমার মনে পড়ে ভেতরকার সেই দুর্বোধ্য খশখশ মরমর আর এক ঠাণ্ডা আবছায়া আর 'আমি' ; জগৎ খুলে গেলো তার/আমার সামনে বিপুল আর ঝিকমিক, রঙের পর রঙ ভেঙে পড়লো, ছড়িয়ে পড়লো ; আমার আরো মনে পড়ে সে কেমন পরম বিস্ময় ছিলো আমার নড়াচড়ায় যখন পেরিয়ে এলুম দেহলি। খাড়া-খাড়া ডালপালার রঙিন বিশৃঙ্খলার ওপর আছড়ে পড়ছিলো জোরালো আলো ; আমি দেখেছিলুম তাদের গোলকগুলো, যারা যে-কোনো দিকে ফেরাতে পারে ছোটো-ছোটো বোতামগুলো, সজল, কিন্তু তবু যারা উজ্জ্বল হ'য়ে আছে, তারপর আশপাশের মুখর মর্মরধ্বনি মিলিয়ে গেলো ক্রমে, আর সমাগত স্তব্ধতার মধ্যে সেই জিনিশ যে মূলত 'আমি' আরো-এক পা বাড়ালো।

আর তারপর, শোনা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়, এমন-একটা শব্দ ক'রে আমার ভেতরে একটা সূক্ষ্ম সুতো ছিঁড়ে গেলো, আর আমি—আমি এখন এক মেয়ে, তরুণী—এমন তীব্রভাবে অনুভব করলুম আমার যোনির

তাড়া যে মাথা ঘুরে গেলো আমার, আমি চোখ বুজে ফেললুম। আর যখন আমি দাঁড়িয়ে আছি এইভাবে, মুদিত নয়ন, আমার চারপাশ থেকে কথা ভেসে এলো, কারণ তার যোনির সঙ্গে-সঙ্গে সে পেয়ে গেছে ভাষাকেও। চোখ খুললুম আমি আস্তে, স্মিত হাসলুম একটু, আর সামনে এগিয়ে গেলুম, আর আমার সঙ্গে-সঙ্গে তার পোশাকও এগিয়ে গেলো। আমি হেঁটে গেলুম, গর্বিত ও শালীনশোভন, সারা গা ঘিরে আছে ফাঁপানো ঘাঘরা ; কোথায় চলেছি জানা নেই, তবু চলেছি, কারণ এটা যে দরবারের বলনাচের আসর, আর এই-যে একটু আগেই সে ভুল করেছিলো, তার স্মৃতি, যখন আমি তাদের মাথাগুলোকে ভেবেছিলুম গোলক ব'লে আর চোখগুলোকে সজল বোতাম, আমাকে কেমন ছেলেমানুষি বিভ্রমের মজা পাইয়ে দিলে, আর আমি হেসে ফেললুম, কিন্তু এই হাসি আর কারু জন্যেই নয়, একান্তভাবেই আমার নিজের উপভোগের জন্য। আমার শ্রবণ দূর ছুঁয়ে আসে – এত তীক্ষ্ণ, এত সজাগ, এত উৎসুক, আর আমি শুনতে পেলুম সব মৃদু কথার মর্মর, পুরুষদের ঘন চাপা দীর্ঘশ্বাস, নারীদের ঈর্ষাতুর দ্রুত নিশ্বাস, আর, 'কাউন্ট, জানেন এই তরুণী কে'? আর এক মস্ত হলঘরের মধ্য দিয়ে হেঁটে এলুম আমি ; ওপরে ঝুলছে স্ফটিকঝাড়ের মাকড়শা, ছাতে জড়িয়ে-রাখা জাল থেকে তারা ছড়িয়ে দিচ্ছে গোলাপের পাপড়ি ; বুড়ি সব মহিলাদের রঙমাখা মুখে অসন্তোষ, দরবারের পাণ্ডুর গণ্যমান্যদের চোখে লোলুপ কাম ; নিজের দিকে অপ্রিয়ভাবে বিরসভাবে তাকালুম আমি একবার।

জানলার ওপাশে ধনুকের মতো বাঁকা খিলান থেকে অলিন্দ পর্যন্ত হাঁ ক'রে আছে রাত, বীথিকায় জ্বলছে ধুপতি, আর দুই জানলার মাঝখানে এক মর্মরমূর্তির তলায় এক ছায়াকুঞ্জে দাঁড়িয়ে আছে এক পুরুষ, অন্যদের চেয়ে মাথায় খাটো ; তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কালো আর পিঙ্গল ডোরাকাটা জামা পরা সভাসদেরা ; যারা তার কাছে যাবার জন্য উৎসুক খুবই, কিন্তু তবু সেই বৃত্তের ফাঁকা বলয়টিকে তারা কখনোই পেরিয়ে যাচ্ছে না ; আর আমি যখন কাছে এলুম এই একা পুরুষটি আমার দিকে তাকালোও না একবার। থেমে পড়লুম আমি ; যদিও সে মোটেই আমার দিকে তাকাচ্ছে না, তবু আমার আঙুলের ডগাগুলো ঘাঘরার প্রান্ত তুলে ধরলো, আমি, চোখ নামালুম যেন নুয়ে তাকে অভিবাদন করবো, কিন্তু আমি শুধু আমার হাত দুটির দিকে

তাকালুম, পেলব দীঘল আর শাদা। আর জানি না কেন, আশমানি-রঙা ঘাঘরার পাশে এই উজ্জ্বল শ্বেত আভা, কেমন যেন ভয় পাইয়ে দিলে আমাকে। কিন্তু সে, সেই বেঁটে পুরুষটি, হয়তো সে কোনো সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত কেউ, যাকে ঘিরে আছে সভাসদেরা, যার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে বিবর্ণ এক যোদ্ধা-পুরুষ, বর্মে ঢাকা বুক, মাথায় সোনালি চুল উষ্ণীষহীন, হাতে ছোট্ট এক কৃপাণ যেন কোনো খেলনা, সে একবারও আমার দিকে তাকালে না, কী যেন ব'লে গেলো আপন মনে, নিজেকে শুনিয়ে, বিরক্তিভরা একঘেয়েমিতে ভরা চাপা নিচু স্বরে। আর আমি, অভিবাদন না-ক'রে, একটুক্ষণ শুধু তীব্র চোখে তাকিয়ে রইলুম তার দিকে, যাতে মনে রাখতে পারি এই মুখ, ঠোঁটের কাছটা বাঁকা, কারণ চিবুকে একটা শাদা কাটা দাগ, আর তাতে টান লেগে মুখের কোণটা কেমন অবসন্নভাবে বিকৃত; এই মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলুম আমি, ঘাঘরা খশখশ শরশর শব্দ করলো, আমি তার পাশ কাটিয়ে চ'লে গেলুম। শুধু তখনই সে আমার দিকে তাকালো, আর আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পারলুম সেই দ্রুত শীতল লক্ষ্যভেদী দৃষ্টি, এত কঠোর ও সংকীর্ণ, যেন সে কোনো অদৃশ্য বন্দুকে তার গাল ঠেকিয়ে সে আমার গ্রীবাকে তাগ করেছে, আমার সোনালি কোঁকড়া চুলের গুচ্ছের ঠিক মাঝখানে – আর, এই হ'লো দ্বিতীয় সূচনা। ফিরে দাঁড়াতে চাইনি আমি, অথচ তবু আমি ফিরে দাঁড়িয়ে দুই হাতে ঘাঘরা তুলে ধ'রে নুয়ে গভীরভাবে তাকে অভিবাদন করলুম, এত নুয়ে যেন সেই চকচকে মেঝে ফুঁড়ে সোজা ভেতরে ঢুকে যাবো, কারণ সে যে রাজা। তারপর আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে স'রে গেলুম; অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগলুম কেমন ক'রে এত নিশ্চিতভাবে জেনে গিয়েছি যে সে-ই হ'লো রাজা; কেন যেন কিছু-একটা ক'রে ফেলার তীব্র ইচ্ছে হ'তে লাগলো আমার, বেমানান কিছু, অশোভন কিছু; কারণ যদি আমার পক্ষে এটা জানা সম্ভবই না-হয় অথচ তবু যদি আমি জানি, প্রখর, সুস্পষ্ট, সুনিশ্চিত, তাহ'লে এই সবটাই নিশ্চয়ই স্বপ্ন, আর স্বপ্নে কারু নাক ধ'রে টেনে দিলে কীই বা ক্ষতি হয়? একটু ভয় পেয়ে গেলুম আমি, কারণ এমন-কিছু করার কোনো ক্ষমতাই ছিলো না আমার, যেন আমার ভেতরে কোথাও আছে কোনো অদৃশ্য অলঙ্ঘ্য বাধা। এইভাবে দ্বিধার ঘোরে হেঁটে গেলুম আমি, কোনো দিকেই কোনো খেয়াল নেই, শুধু স্বপ্ন আর বাস্তবতার দ্বৈরথের মধ্যে

অনিশ্চিত : আর তারই মধ্যে জ্ঞান গড়িয়ে এলো আমার মধ্যে, ঢেউয়ের পর ঢেউ যেমন ক'রে গড়িয়ে আসে সৈকতে, আর প্রতিটি ঢেউ যেমন ক'রে রেখে যায় নতুন তথ্য, তেমনিভাবে সব পদবি খেতাব উপাধি ভূষণ জেনে গেলুম আমি ; হলঘরটা অর্ধেক পেরুবার আগেই, আগুন-লাগা কোনো জাহাজের মতো দোদুল্যমান জ্বলন্ত শামাদানের তলায়, আমি সব মহিলাদের নামধাম জেনে গেলুম, সযত্নরচিত প্রসাধনকলায় যারা তাদের মুখের ভাঙচোরগুলো প্রাণপণে ঢেকে রেখেছে ।

যেন কোনো দুঃস্বপ্ন থেকে পুরোপুরি জেগে উঠেছে কেউ, অথচ তার স্মৃতির রেশ তখনও অটুট আছে, এমনিভাবে এত-কিছু এত-সব জেনে গেছি আমি এখন : আর যা ছিলো অনধিগম্য আমার মনের মধ্যে দুটি কালো ছায়ার মতো তা এসে হাজির এখন—আমার অতীত আর আমার বর্তমান, কারণ নিজের সম্বন্ধে আমার সত্যি কিছুই জানা ছিলো না, কিছুই না । আমি এখন সম্পূর্ণভাবে অনুভব করছি আমার নগ্নতা—স্তন, উদর, উরুদেশ, গ্রীবা, কাঁধ, মূল্যবান পোশাকের আড়ালে অগোচর দুটি পা – আমি আস্তে-আস্তে স্পর্শ করলুম আমার দুই স্তনের মধ্যে জোনাকির মতো জ্ব'লে-ওঠা সোনায় বসানো পোখরাজ ; আমার মুখের ভাব কী এখন, তা শুদ্ধু এখন আমি অনুভব করতে পারছিলুম – মনের মধ্যে কী তোলপাড় চলেছে তার কোনো ছাপ নেই সেখানে, তবু আমার মুখের ভাব বিমূঢ় ক'রে দিতো কাউকে যদি সে তাকাতো দেখতে পেতো ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম হাসির ছাপ, অথচ যদি গভীরভাবে আমার মুখ চোখ ভুরু তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখতো সে কোথাও কিন্তু কোনো আমোদের চিহ্ন খুঁজে পেতো না - এমনকী কোনো ললিত নম্র আমোদের চিহ্নও না, যাতে সে আরো-একবার আমার চোখে চোখ রাখতে পারে : কিন্তু আমার চোখ দুটো শান্ত, নিস্তরঙ্গ, আমার চিবুকে কোনো লাস্যভরা টোল নেই – আমার গাল মসৃণ আর গৌরাভ, আর চিবুক কঠিন, শান্ত, অচঞ্চল—আমার গ্রীবার মতোই সুঠাম, কিন্তু না, কোনো রহস্যেরই উন্মোচন হ'তো না সেখানে । আর তখন দ্রষ্টা নিশ্চয়ই মুশকিলে পড়তো, ভাবতো কেন সে ভেবেছিলো যে আমি হাসছি, আর আমার রূপ আর তার নিজের দ্বিধা তাকে এমনি বিমূঢ় ক'রে দিতো যে সে পেছিয়ে মিশে যেতো ভিড়ের মধ্যে কিংবা হয়তো নুয়ে আমাকে অভিবাদন করতো আমাকে, যাতে ঐ ভঙ্গিটার

আড়ালে সে নিজেকে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে ফেলতে পারে।

কিন্তু দুটো জিনিশ আমি এখনও জানি না, যদিও অস্পষ্টভাবে কেমন যেন বুঝতে পেরেছিলুম সেই দুটো জিনিশই সবচেয়ে জরুরি। আমি যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম রাজা কেন আমাকে এমনভাবে অবজ্ঞা করছিলেন? আমার রূপলাবণ্যকে তিনি ভয়ও পাননি কিংবা কামনাও করেননি, তবু কেন আমার চোখে চোখ রেখে তিনি তাকাননি? অথচ আমি অনুভব করেছিলুম যে আমি তাঁর কাছে সত্যি দামি, সত্যি জরুরি, কিন্তু কীভাবে বা কেন, তা জানি না—যেন ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্যই 'আমাকে' তাঁর কোনো দরকার নেই, আমি যেন তাঁর কাছে এই ঝলমলে হলঘরে নেই—তার বাইরে আছি কোথাও, আমি যেন এমন-কেউ সরদলে-সরদলে ব্রনজে-খোদাই রাজপ্রতীক বসানো এই স্ফটিকস্বচ্ছ বর্ণচ্ছুরিত মসৃণ নৃত্যসভায় যার নাচার কথা নয়; অথচ আমি যখন পাশ কাটিয়ে চ'লে গেলুম, কোনো ভাবনাই ভেসে ওঠেনি তাঁর মনের মধ্যে, যা থেকে আমি তাঁর রাজকীয় আকাঙ্ক্ষার খানিকটা আভাস পেতে পারি; এমনকী যখন ওভাবে তাকিয়েছিলেন আমার পেছনে, দ্রুত ও অভাবিত, আতঙ্কজাগানো ও সুকঠোর, কোনো অদৃশ্য বন্দুকের পরকলা দিয়ে, আমি বুঝতে পেরেছিলুম তাঁর ঐ পাণ্ডুর চোখদুটি আমার ওপর প্রক্ষিপ্ত হয়নি: আর তাঁর ঐ চোখ, তাকে তো ঢেকে রাখা উচিত কালো চশমার আড়ালে, কারণ ঐ চোখে কোনো অনুভূতির ছাপ নেই, ঐ অভিজাত মুখের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই, ঐ চোখ যেন বাটির মধ্যে হাত-ধোবার পর নোংরা জল—ঠিক এমনিভাবে ঐ আভিজাত্যেভরা মুখ খাঁজ কেটে বসানো। না, তাঁর চোখ দুটি অনেক আগেই হারিয়ে গিয়েছে, দিনের আলো সইতে-না-পেরে, অথচ যার সত্যিই প্রয়োজন ছিলো কোনো পরদার আবরণ।

কিন্তু আমার কাছে তাঁর কী চাইবার আছে কী এ নিয়ে ভাবার অবসর ছিলো না আমার, কারণ আরেকটা জিনিশ আমার মনোযোগ দাবি ক'রে বসেছিলো। এখানে যারা আছে, তাদের সবাইকে আমি চিনি, কিন্তু আমাকে কেউই জানে না। হয়তো শুধু তিনি ছাড়া, হয়তো তিনিই একা জানেন আমাকে; তিনি, রাজা। আমার নিজের সম্বন্ধে আমি এখন সব জানি, যেন সব নখদর্পণে আছে আমার। আর কেমন যেন অদ্ভুত ঘুলিয়ে গেলো আমার

সব অনুভূতি, এখন অনেক মন্থর হ'য়ে এসেছে আমার চলা, হলঘরের তিনভাগই পেরিয়ে এসেছি আমি, ভিড়ের মুখগুলো সব অসাড়, অবশ; জুলপিগুলো তুষারশুভ্র ; রক্তে ফোলা সব মুখ, দলা-দলা পাউডারের তলায় ঘেমে-যাওয়া ; ফিতে, পদক, ভূষণ আর জমকালো বিনুনির এই ভিড় – আর এই বর্ণচ্ছুরিত ভিড়ের মধ্যে দু-দিকে সবাই স'রে গিয়ে খুলে দিলে এক বারান্দা, যাতে আমি রানীর মতো হেঁটে যেতে পারি, তাদের চোখের ওপর দিয়ে – কিন্তু কোথায়, কোনখানে আমি এভাবে হেঁটে চলেছি ?

কার কাছে ?

আর, আমি কে ? পর-পর এগিয়ে এলো চিন্তারা, সাবলীলভাবে, দক্ষ আর সুপটু। আমার বিমূঢ় অবস্থা আর এই বিশিষ্ট সমাবেশ – এই দুয়ের মধ্যে যে বিশেষ-এক বেসুরো অমিল, তা আমি মুহূর্তে ধ'রে ফেলেছিলুম। কারণ এদের প্রত্যেকেরই আছে ইতিহাস, পরিবার, কোনো-না-কোনো ভূষণ ; ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্ত মৈত্রী — এইসব থেকেই তারা পেয়েছে তাদের ক্ষমতা আর আভিজাত্য ; প্রত্যেকেই কেমন নিজের-নিজের নোংরা অহমিকা ফাঁপিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পেছনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ব্যক্তিগত অতীত – মরুভূমির বহর যেমন মোড়ে-মোড়ে পেছনে তুলে দেয় ধুলোর দীর্ঘ ঘূর্ণি ; আর আমি ? আমি এসেছি অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে, এমন কোনো দূর থেকে যেন আমার অতীত শুধু একটা নয়, বরং যেন অতীতের পর অতীত আছে আমার, অনেক অতীত, জটলা-পাকানো জটবাঁধানো ; কারণ আমার নিয়তি এখানকার এই সমাবেশের কাছে বোধগম্য হবে তখনি যখন আঞ্চলিক সংস্কারের টুকরোয় ছোটো ছোটো ক'রে তর্জমা ক'রে দেয়া হবে, তর্জমা ক'রে দেয়া হবে এই খুব-চেনা অথচ বিদেশী ভাষায়, আর তাই তাদের বোধের কাছে কেবল অংশতই তুলে ধরতে পারবো আমি নিজেকে, এবং আংশিক ব'লেই অযথাযথ, আর প্রতিটি নির্ধারিত আখ্যা একেকটি ভিন্ন ব্যক্তিত্ব হ'য়ে উঠবে তাদের কাছে। আমার কাছেও কি তা-ই হবে শেষে ? না…অথচ প্রায় তাই-ই, এক অর্থে, কারণ হলঘরের দরজায় হুড়মুড় ক'রে আমার মধ্যে যে-স্মৃতি ঢুকে পড়েছিলো তার বেশি কিছুই তো আমার জানা নেই - নিরেট সব বাঁধ

ভেঙে প্লাবন যেমন ক'রে ঢুকে পড়ে রুক্ষ ঊষর বন্ধ্যা জমিতে ঠিক তেমনিভাবে তখন আমার মধ্যে যা ঢুকে পড়েছিলো তার বাইরে আমি তো শুধু যুক্তি সাজিয়ে প্রশ্ন করতে পারি : একই সঙ্গে কি অনেক হওয়া যায়? পরিত্যক্ত সব অতীতের বহুত্ব থেকে কি সৃষ্টি ক'রে নেয়া যায় কোনো-একটি অটুট অস্তিত্ব ? আমার যুক্তির বোধ তো আসলে স্মৃতি-বিস্মৃতির ভাসমান শ্যাওলার নির্যাস ; আর সে-ই আমাকে ব'লে দিলে যে না, তা মোটেই সম্ভব নয় ; যে আমার নিশ্চয়ই কোনো-একটি বিশেষ অতীত আছে ; আর যদি আমি হই কাউন্ট টেলেনিক্সের দুহিতা, রানীর সহচরী, জোরোএন্নাই, তরুণী ভারজিনিয়া, বিদেশে সমুদ্রের ওপারে লাঙ্গোডটদের দেশে বালান্দিয়ান গোষ্ঠী যদি আমার মা-বাবাকে বধ ক'রে থাকে, বাস্তব থেকে কল্পনাকে যদি আলাদা করে নিতে না-পারি আমি, তাহ'লে আমি কি সত্যি স্বপ্ন দেখছি না? কিন্তু এখন কোথায় যেন বেজে উঠলো অর্কেস্ট্রা, আর নাচ গড়িয়ে এলো ঝমঝম, পাথরের কোনো সম্প্রপাতের মতো—কেমন ক'রে কেউ পারে বাস্তবতার চেয়েও আরো-বাস্তব কিছুতে বিশ্বাস করতে? কেমন ক'রে পারে জেগে উঠতে এক জাগরণ থেকে অন্য-কোনো জাগরণে ?

সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেলো আমার মধ্যে, অপ্রীতিকর অরুচিকর এক বিশৃঙ্খলা ; আবার সেই মাথা-ঘোরানো ভাবটা ফিরে এসেছে, সেই ঘূর্ণিরোগ ; আমি সাবধানে পা ফেলে-ফেলে হাঁটছি। কিন্তু সেই রানীর মতো চলন ছাড়িনি তাই ব'লে, এক ফোঁটাও ছাড়িনি, যদিও সেই ভঙ্গি বজায় রাখতে গিয়ে কষ্ট হচ্ছে প্রচণ্ড, প্রচণ্ড অথচ অদৃশ্য, আর কেউ যাতে টের না-পায় দেখতে না-পায় সেই জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হচ্ছে আমাকে, তারপর শেষটায় সাহায্য এলো দূর থেকে – আমি টের পেলুম, এক পুরুষের চোখ থেকে—সে আধখোলা এক জানলার পাশে নিচু খাঁজটায় বসেছিলো—কিংখাবের কাজ-করা পর্দা কেমন অদ্ভুত ছড়িয়েছিলো তার কাঁধের ওপর, যেন পর্দাটা তার স্কার্ফ, লাল কেশরওলা সব সিংহ আঁকা পর্দায়, মুকুট মাথায় সব সিংহ, বুড়ো, থুরথুরে সব সিংহ, থাবায় ধ'রে আছে রাজদণ্ড আর দণ্ড-ভূষণ, গোল ভূষণগুলো যেন বিষাক্ত সব আপেলের মতো, যেন ইডেন উদ্যান থেকে আনা। সিংহশোভিত এই পুরুষ প'রে আছে কালো পোশাক ; বহুমূল্য পোশাক, কিন্তু এমন-একটা স্বাভাবিক তাচ্ছিল্যের ভাব তার ভঙ্গিতে, যার

সঙ্গে এই কৃত্রিম জনসমাবেশের কোনোই মিল নেই। এই অচেনা মানুষটি শৌখিনও নয়, বিলাসীও নয়; নয় সে কোনো তোষামোদকারী সভাসদ কিংবা কোনো চাটুকার মোসাহেব; তার বয়েসও বেশি নয়; এই হট্টগোলের মধ্যে সে ব'সে আছে একা, আলাদা—আমার দিকে চোখ তুলে তাকালে সে, এই ভিড়ের মধ্যে আমার মতোই পুরোপুরি একা সে, যদিও তার চারপাশে ঘিরে আছে সেই তারা যারা সঙ্গিনীদের চোখের সামনে ব্যাঙ্কনোট ভাঁজ ক'রে সিগারিলো বানিয়ে জ্বালিয়ে নিচ্ছে, সবুজ কাপড়ের উপর ছুঁড়ে জায়ফল ছুঁড়ে দিচ্ছে তারা, কোনো পুকুরের রাজহাঁসদের উদ্দেশে, তারা ছুঁড়ে দিচ্ছে সোনার মোহর, যেন যাদের কাছে কোনো কাজই নয় আহাম্মুকি বা হীনতার নামান্তর, কারণ তাদের ধারণা যে তাদের আভিজাত্য বা ঐশ্বর্য তাদের অধিকার দিয়েছে যা-খুশি করার। আর এই ভিড়ের মধ্যে, এই হলঘরে, ঐ একা মানুষটি একেবারেই বেমানান; আর এই-যে আপাত-উদ্দেশ্যহীনতার সঙ্গে বশ্যতা মেনে নিয়েছে ঐ রাজকীয় সিংহগুলোর, এই-যে কাঁধের ওপর লুটিয়ে পড়তে দিয়েছে ঐ কিংখাবের আড়ষ্ট পর্দা আর ঐ যে রাজকীয় আরক্তিম আভার প্রতিফলন লুটিয়ে আছে তার মুখে, এই বশ্যতার ভাবটার মধ্যে অতিসূক্ষ্ম একটা বিদ্রূপের ভাব যেন মেশানো। তরুণ সে কিছুতেই নয়, তার সব তারুণ্য যেন তার কালো চোখ দুটিতে তার তীব্র কটাক্ষে জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। আর সে চুপচাপ শুনে যাচ্ছে—কিংবা আদৌ হয়তো শুনছেই না—এক বেঁটেখাটো দোহারা টাকমাথার লোকের কথা—লোকটার ভঙ্গি অনেকটা কোনো লালাঝরা, পেটুক আর অনুগত কুকুরের মতো। সে যখন জানলার খাঁজ থেকে উঠে দাঁড়ালে, তার কাঁধ থেকে খ'শে পড়লো পর্দা, তুচ্ছ রংচঙে কোনো আবর্জনার মতো, আর তার চোখে চোখ পড়লো আমার, অতর্কিত, জোরালো, প্রবল, কিন্তু পরক্ষণেই আমি তার মুখ থেকে সরিয়ে নিলুম। সত্যি, চোখ সরিয়ে নিলুম, শপথ ক'রে বলতে পারি, অথচ তবু আমার দৃষ্টির মধ্যে গভীরভাবে ছাপ ফেলে গেলো ঐ মুখ, যেন হঠাৎ অন্ধ হ'য়ে গেছি আমি, আমার শ্রবণশক্তি হারিয়ে গেলো যেন হঠাৎ, যেন অর্কেস্ট্রার বদলে—মুহূর্তের জন্য—আমি শুধু শুনতে পেলুম আমার চঞ্চল ধমনীকেই। কিন্তু আমার ভুল হ'তে পারে।

খুবই সাধারণ সেই মুখ, এটা আবারও ব'লে নিই। সত্যি-বলতে কেমন যেন অসমঞ্জস সেই মুখ, অথচ বুদ্ধির দীপ্তি মাখানো ব'লে এক ধরনের সৌন্দর্যও আছে; কিন্তু তার এই ধারালো উজ্জ্বল মন নিশ্চয়ই একটা বোঝার মতো তার ওপর চাপানো, যেন তার মন, তীক্ষ্ণ ও লক্ষ্যভেদী, হয়তো কিছুটা আত্মবিধ্বংসী; সন্দেহ নেই যে রাতের পর রাত মেধা তাকে কুরে-কুরে খায়, এটা যে একটা বোঝার মতো এটা স্পষ্ট, সে যে মাঝে-মাঝে খুশিই হ'তো যদি এই বুদ্ধি তার না-থাকতো তাও স্পষ্ট, কারণ এই বুদ্ধি আসলে পঙ্গু ক'রে-ফেলা, এ নয় কোনো বিশেষ অধিকার বা কোনো বহুমূল্য উপহার, বরং অবিশ্রান্ত চিন্তা তাকে নিশ্চয়ই অনবরত মোচড়ায়। বিশেষত সে যখন একা থাকে—আর একাকিত্ব তো তার নিয়তি, ভিড়ের মধ্যেও সে একা, যেমন এখানে আছে এখনও। আর ঐ চমৎকার পোশাকের তলায় তার শরীর—শৌখিন সেই পোশাক, কিন্তু আঁটো হ'য়ে গায়ে ব'সে নেই, যেন তার দরজিকে সে সাবধান ক'রে দিয়েছিলো, সংযত ক'রে দিয়েছিলো—আমাকে ভাবতে বাধ্য করলো তার নগ্নতা।

বোধহয় একটু করুণই হবে তার এই নগ্নতা: নয় চমকপ্রদভাবে পুরুষালি, নয় ব্যায়ামপটু বা পেশীবহুল, বরং যেন নিজের মধ্যে ঢুকে-পড়া, যেন কোনো সাপের বাসা, ফুলে-ওঠা, গ্রন্থিল, পুরু দড়ির মতো পেশল; যেন এখনও পারবে প্রৌঢ়া রমণীদের অতৃপ্ত বাসনাকে যৌন তৃপ্তি দিতে, যেন এখনও উন্মাদ হ'য়ে আছে রতিমিলনের আশায়। কিন্তু শুধু তার মাথাটিরই আছে এই পুরুষালি সৌন্দর্য, মুখের কাছটায় প্রতিভার বক্র রেখা, ভুরু দুটিতে রুষ্ট অধৈর্য, দুই ভুরুর মধ্যে ছুরির তীক্ষ্ণ টানের মতো ভাঁজ, আর তার সেই মসৃণ, প্রবল, তৈলচিক্কণ নাসিকার হাস্যকর ভঙ্গিমা। ও, না, মোটেই সুপুরুষ নয় সে, এমনকী তার কুশ্রীতাও মোটেই আকর্ষণ করে না, সে শুধু অন্যরকম, আর তার চোখে চোখ পড়ার পর আমার সর্বাঙ্গ যদি অবশ ও অসাড় হ'য়ে না-যেতো আমি নিশ্চয়ই সেখান থেকে চ'লে যেতুম।

সত্যি-যে, আমি যদি তাই করতুম, যদি পালিয়ে যেতে পারতুম এই সম্মোহনের গণ্ডি থেকে, সদয়-সহৃদয় রাজা তবে আমার প্রতি যথেষ্ট তাড়াতাড়ি মনোযোগ দিতে পারতেন—তাঁর হাতের আংটির এক মোচড়ে, তাঁর পাণ্ডুর চোখের এক কটাক্ষে আহ্বান করতেন আমাকে তবে। আর

আমি ফিরে যেতুম। কিন্তু সেই মুহূর্তে, হলঘরে, ঐখানে, আমার পক্ষে সে-কথা জানা মোটেই সম্ভব ছিলো না: আমি বুঝতেই পারিনি যে এই আকস্মিক দৃষ্টির মিলন, অর্থাৎ দুই অস্তিত্বের চোখের মণির এই সাময়িক মিশ্রণ – আসলে তো চোখ হ'লো ছোট্ট দুটি কালো গর্ত, মাথার খুলির ভেতরে ঢুকে-পড়ার দুই জানলা – ছিলো নিয়তিনির্দিষ্ট। কারণ, কী ক'রে জানতুম আমি যে এটাই ছিলো ভবিতব্য?

আমি চলতে শুরু করবো, এমন সময় সে উঠে দাঁড়ালে, অস্তিন থেকে সরিয়ে দিলে কিংখাবের পর্দার প্রান্ত, যেন এই বলতে যে নাটক শেষ হ'য়ে গেছে এবার, তারপর এগিয়ে এলো আমার দিকে। দুই পা এগিয়ে এসে সে থমকে দাঁড়ালো, যেন হঠাৎ বুঝতে পেরেছে যে কী-রকম অশোভন ও অশালীন হ'লো তার এই কাজ, কোনো অচেনা রূপসীর দিকে আহাম্মকের মতো এভাবে এগিয়ে-আসাটা কেমন অভাবনীয় ও রীতিবিগর্হিত ঠেকবে সকলের কাছে, আর তাই সে দাঁড়িয়ে রইলো ঠায়, আর একটা হাত মুঠো করলুম আমি, আর অন্য হাতের কব্জি থেকে খুলে প'ড়ে গেলো আমার ছোট্ট পাখাটা। আসলে প'ড়ে যেতে দিলুম আমি। আর সে তক্ষুনি…

পরস্পরের দিকে তাকালুম আমরা: এখন দাঁড়িয়ে আছি পরস্পরের মুখোমুখি, কাছাকাছি, আমার পাখার মুক্তো-বসানো ডাঁটির ওপর। গরীয়ান এক মুহূর্ত, ভয়াবহ এক মুহূর্ত, আর আমার গলায় যেন প্রচণ্ড হিমশীতল এক আঘাত পড়লো, সব কথা ম'রে গেলো মুখে, মনে হ'লো কথা বলতে গেলে শুধু একটা ভাঙাচোরা আওয়াজই বুঝি বেরুবে। আমি তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লুম, আর এই ভঙ্গিটা হ'লো ঠিক আগের মতো, অসমাপ্ত ও আড়ষ্ট, যখন রাজা তাকাননি ব'লে আমি আমার অভিবাদন শেষ করিনি।

সে অবশ্য ফিরে মাথা নাড়েনি—তার নিজের মধ্যে যা ঘটছে তখন তাতে সে এতই চমকে গিয়েছিলো এতই অবাক হ'য়ে গিয়েছিলো যে তার সাড়া দেবার কোনো ক্ষমতাই ছিলো না। কারণ নিজের কাছ থেকে এটা সে আশা করেনি। আমি জানি, কারণ পরে সে আমাকে বলেছিলো; কিন্তু যদি কখনো না-ও বলতো, তবু আমি জানতে পারতুম।

কিছু-একটা বলতে চাচ্ছিলো সে, কোনো-একটা কথা, যাতে তাকে আহাম্মকের মতো না-দেখায়, আর তাও আমি বুঝতে পেরেছিলুম।

'আপনার পাখা,' কেমন শুওরের মতো গলা ঝেড়ে সে বললে।

ততক্ষণে আমি শামলে উঠেছি। শামলে উঠেছি নিজে, আর তাকে পেয়েছি আমার মুঠোয়।

আমার গলার স্বরের দানা একটু রহস্যময় ও গাঢ় হ'য়ে এলো—কিন্তু সে তো আমার স্বাভাবিক গলার স্বর জানে না—সে তো এর আগে কখনোই আমার কথা শোনেনি। আমি বললুম, 'আবার কি ফেলবো পাখাটা ?'

আর হালকাভাবে হাসলুম আমি ; না, না, কোনো মোহিনী হাসি নয়, কিংবা উশকে দেবার জন্যও নয়. কোনো উজ্জ্বল হাসিও নয় সেটা। হাসলুম এই জন্য যে আমি বুঝতে পেরেছিলুম আমি লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠেছি। এই ব্রীড়া যেন আমার নয়, সারা গালে ছড়িয়ে পড়লো লাল আভা, দখল ক'রে বসলো আমার সারা মুখ, গোলাপি ক'রে দিলো কানের লতি—আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিলুম সবকিছু—কিন্তু মোটেই বিব্রত বা সংকুচিত বোধ করিনি আমি, বোধ করিনি কোনো উত্তেজনা, এই অচেনা মানুষটিকে নিয়ে কোনো কথাই ভাবিনি—সে তো আসলে অনেকের মধ্যে একজন, সব সভাসদের ভিড়ের মধ্যে আরেকজন মাত্র—আমি আরো বলবো : এই ব্রীড়ার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই ছিলো না—হলঘরের চৌকাঠের কাছে এই স্ফটিকের মেঝেয় পা দেবামাত্র যেখান থেকে সব স্মৃতি ঢুকে পড়েছিলো আমার মধ্যে, সেই একই উৎস থেকে উৎসারিত হ'লো এই ব্রীড়া—এই রক্তিম আভা মনে হ'লো রাজসভার আদবকায়দারই অঙ্গ—এই পাখা, এই ঘাঘরা, এই কেশসজ্জা আর জড়োয়া গয়নার মতোই জরুরি। আর তাই এই ব্রীড়াকে উড়িয়ে দেবার জন্য, যাতে কোনো মিথ্যে সিদ্ধান্তে কেউ না-পৌঁছোয়, আমি হালকাভাবে হাসলুম : তার জন্য নয়, তার প্রতি; আমোদ আর ঘৃণার মধ্যবর্তী সীমান্তকে কাজে লাগালুম, আর এবার সে শান্ত হাসিতে ফেটে পড়লো, স্তব্ধ হাসি, শব্দহীন, যেন ভিতরমুখো প্রচালিত, যেন কোনো ছোট্ট ছেলের হাসি যে নিষেধ মানতে চাচ্ছে অথচ ব্যাপারটা জানে ব'লেই কিছুতেই যে আর তার হাসি চাপতে পারছে না। আর এই হাসির মধ্যেই সে মুহূর্তে তারুণ্যে ভ'রে গেলো।

'যদি একটা মুহূর্ত দেন,' হঠাৎ যেন কোনো নতুন ভাবনা খেলে গেছে তার মাথায়, এমনিভাবে সে গম্ভীর হ'য়ে উঠলো, 'তাহ'লে আপনার কথার

যোগ্য কোনো উত্তর ভাবতে পারি—দারুণ সপ্রতিভ ও লাগসই কোনো কথা। কিন্তু সাধারণত কেবল সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময়ই আমার মাথায় চমৎকার সব ভাবনা খেলে যায়।'

'আপনার উদ্ভাবনী প্রতিভা কি এতই নিঃস্ব ও নিঃসহায়?' এই নাছোড় ব্রীড়া আমাকে এতক্ষণে চটিয়ে দিতে শুরু করেছে; আমি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করলুম গাল মুখ কানের দিকে; কারণ এই আরক্তিম আভা—আমার স্বাধীনতা খর্ব ক'রে দিচ্ছে আর মনে হচ্ছিলো—রাজা আমার জন্য যে-নিয়তি যে-ভবিতব্য আদিষ্ট করেছেন, এটা যেন তারই অংশ, ঠিক তেমনিভাবেই উদ্দেশ্যময়।

বোধহয় আমার জিগেশ করা উচিত, "কোনো কি উদ্ধার নেই? আর আপনি উত্তর দেবেন, "না", যে-রূপ যে-সৌন্দর্য কোনো পরম শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করায়, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উদ্ধারের কোনো আশাই নেই। তারপর অর্কেস্ট্রার একটু ঝমঝম আওয়াজ, আর আমরা আবার রাশ টেনে ফিরে যাবো প্রাত্যহিকতায়, খুব সুষ্ঠুভাবে কথাবার্তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো রাজসভার সাধারণ সব প্রসঙ্গে। যাই হোক, আপনাকে দেখে যেহেতু মনে হচ্ছে কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করছেন, তো আসুন, আমরা তাহ'লে বরং চকচকে ঝকঝকে কথাবার্তা বলার প্রলোভন ত্যাগ করি…

এখন সে সত্যি ভয় পাচ্ছে আমাকে, এই কথাগুলো শুনে…আর ঠিক কী যে বলবে, ভেবে উঠতে পারছে না। তার চোখে এত বিষাদ জ'মে আছে যে মনে হয় সে বুঝি দাঁড়িয়ে আছে কোনো ঝড়ের মধ্যে, গির্জে আর জঙ্গলের মাঝখানে—কিংবা এমন-কোথাও, যেখানে, সত্যি, শেষ পর্যন্ত কিছুই যেন নেই।

'কে আপনি?' একটু আড়ষ্টভাবে সে জিগেশ করলে। কোনো মামুলি তুচ্ছ জিনিশের চিহ্ন নেই তার মধ্যে, কোনো ভান বা আড়াল নেই: সে শুধু ভয় পেয়েছে আমাকে। আমি মোটেও ভয় পাইনি তাকে, মোটেও না, যদিও আমারও বাস্তবিক ভয় পাওয়া উচিত ছিলো, কারণ তার মুখটা দেখতে পাচ্ছিলুম আমি, তার অবাধ্য ঝোপের মতো ভুরু, তার কানের মস্ত বক্ররেখা, তার মুখের সব লোমকূপ—সব আমার মধ্যে জুড়ে যাচ্ছিলো, আমার প্রত্যাশার মধ্যে সব মিশে যাচ্ছিলো, যেন আমি আমার ভেতরে ব'য়ে

বেড়াচ্ছি তার ছবির নেগেটিভ, তখনও ফুটিয়ে তুলিনি, আর সে যেন এইমাত্র সব অনুপুঙ্খ ভ'রে দিলো তার মধ্যে। অথচ সে-ই যদি হয় আমার ভবিতব্য, আমার নিয়তি, তবু তাকে আমি ভয় পাইনি। নিজেকে ভয় পাইনি আমি, তাকেও না. কিন্তু এই যোগসূত্রের আভ্যন্তর-ও নিশ্চল জোর ,আমাকে শিউরে তুললো – কোনো মানুষ যেমন ক'রে শিউরে ওঠে, তেমনভাবে নয়, বরং কোনো ঘড়ির মতো, যখন ঘড়ির কাঁটা দুটো এক জায়গায় মিলে যায় ঘণ্টা বাজাবে ব'লে ঢংঢং—যদিও তখনও নিঃশব্দ, স্তব্ধ। কেউ, কেউই দেখতে পায়নি সেই শিহরন।

'বলবো একসময় আপনাকে,' খুব শান্তভাবে আমি উত্তর দিলুম। স্মিত হাসলুম আমি, হালকা, অস্ফুট, ক্ষীণ, কোনো দুর্বল রোগীকে উৎসাহ দেবার জন্য যেমন ক'রে কেউ হাসে, আর আমার পাখাটা মেলে ধরলুম।

'আমি পছন্দ করবো এক গেলাশ মদিরা। আর আপনি ?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিলে সে, যেন এই শৈলীটা সে নিজের গায়ে চাপবার চেষ্টা করছে—মোটেই সে অভ্যস্ত নয় এমন ভঙ্গিমায়, এমন ধরনে, মোটেই মানাচ্ছে না তাকে, কেমন অলবড্যে, আড়ষ্ট লাগছে তাকে সব মিলিয়ে। আর আমরা হেঁটে গেলুম হলঘর দিয়ে : ঝাড়লণ্ঠন বেয়ে ঝরছে মুক্তোর দানার মতো মোম ; শামাদান থেকে ধোঁয়া উঠছে ; আমরা হেঁটে গেলুম পাশাপাশি. যেখানে দেয়ালের গা ঘেঁষে পাশে দাঁড়িয়ে ধবধবে সব ভৃত্যেরা পানীয় ফেলছে পানপাত্রে।

আমি যে কে, তা আমি তাকে সে-রাতে বলিনি : মিথ্যে কথা বলতে চাইনি তাকে আর আমি তো নিজেও সত্যি জানতুম না আমি কে। সত্য কখনও নিজেকে অস্বীকার করে না, আর আমি তো এক ডিউকদুহিতা, রানীর সহচরী, কাউন্টেস, মাতৃপিতৃহীন : এই বংশপরিচয় আমার ভেতরে অবিশ্রাম ঘূর্ণি তুলছিলো ; যদি আমি এর কোনোটাকে স্বীকার করতুম, তক্ষুনি সেটা বাস্তব হ'য়ে উঠতো : এখন আমি বুঝতে পারি যে সত্য শুধু আমার নির্বাচন আর খেয়ালের ওপরেই নির্ভর করছিলো ; যে আমি যা-ই ঘোষণা করতুম তা ছাড়া বাকি সব প্রতিকল্প মুহূর্তে

মিলিয়ে যেতো ; কিন্তু এই সব সম্ভাবনাগুলোর মধ্যে মনস্থির ক'রে নিতে পারিনি, কারণ মনে হচ্ছিলো এদেরই মধ্যে কোথাও লুকিয়ে আছে স্মৃতির ছলনা. স্মৃতির কৌশল—আমি কি তবে এমন রোগী যে তার স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছে, যে পালিয়ে এসেছে তার উদ্বিগ্ন আত্মীয়স্বজনের সজাগ পরিচর্যা থেকে ? আমি কি অ্যামনেশিয়ায় ভুগছি, স্মৃতিভ্রংশতায় ? তার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে আমি ভাবলুম যে যদি আমি সত্যি পাগল হই, কোনো উন্মাদিনী, তাহ'লে সবকিছু বেশ ভালোভাবে শেষ হবে। যেমন উন্মত্ততা থেকে, তেমনি স্বপ্ন থেকেও, কেউ চেষ্টা করলে মুক্তি পেতে পারে—এই দুই ক্ষেত্রেই আশা আছে, আছে উদ্ধারের উপায়।

শেষ রাতের দিকে যখন—আর সে অতক্ষণ কক্‌খনো. একবারও, আমার পাশ ছেড়ে যায়নি—আমরা একবার রাজার পাশ দিয়ে গেলুম. তিনি তাঁর নিজের ঘরে অবসর নেবার আগে ; আমি অনুভব করলুম যে তিনি একবারও আমাদের দিকে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করেননি—আর এটা আমার কাছে এক নিদারুণ আবিষ্কার। কারণ আরহোডেসের পাশে আমি কীভাবে ব্যবহার করছি, এটা জানার কোনো চেষ্টাই রাজা করেননি, সেটা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় ঠেকেছিলো তাঁর কাছে, যেন তিনি তর্কাতীতভাবে জানেন যে আমার ওপর তিনি সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন, যেমনভাবে লোকে—পুরোপুরি—আস্থা রাখে ভাড়া-করা আততায়ীর ওপর, গুপ্তঘাতকের ওপর, যারা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত, চেষ্টা ক'রেই যায়, কারণ তারা জানে তাদের ভাগ্য নির্ভর করছে তাদের নিয়োগকর্তার ওপর। অথচ রাজার ঔদাসীন্য, আমার সব সন্দেহ মুছে ফেলতে পারতো, যদি তিনি একবারও আমার দিকে না-তাকান, তাহ'লে তাঁর কাছে আমার দাম কানাকড়িও নয়, তাঁর সঙ্গে, তাহ'লে, কোনো সংস্রবই নেই আমার ; অথচ তবু যে আমি কোনোভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছি, নিগৃহীত হচ্ছি, এই অপ্রতিরোধ্য বোধ কেবল আমার মনের রোগের দিকেই পাল্লা ঝুঁকিয়ে দিচ্ছিলো। আর, তাই কোনো রূপসী উন্মাদিনী হিশেবেই আমি হাসলুম, আরহোডেসের সঙ্গে মদিরা সেবন করলুম, যাকে রাজা এমন তীব্রভাবে ঘৃণা করেন, আর কাউকেই তিনি এত ঘৃণা করেন না, অথচ তার মুমূর্ষু মায়ের কাছে রাজা কথা দিয়েছিলেন যে যদি কখনও

আরহোডেসের কোনো বিপদ হয় তবে সেটা হবে তারই স্বকৃত, রাজার তাতে কোনো হাতই থাকবে না। আমি জানি না নাচের মধ্যেই কেউ আমাকে এ-কথা বলেছিলো কিনা, কিংবা আমি নিজে-নিজেই আমার স্মৃতির মধ্যেই এই তথ্যটা খুঁজে পেয়েছিলুম কিনা, কারণ রাতটি ছিলো দীর্ঘ প্রলম্বিত ও কোলাহলমুখর; সেই বিপুল ভিড় অনবরত আমাদের বিচ্ছিন্ন ক'রে দিচ্ছিলো, অথচ তবু তেমনি অনবরত পরস্পরকে খুঁজে পাচ্ছিলুম, ইচ্ছে ক'রে নয় – এমনিতেই, যেন যারা সেখানে ছিলো সবাই কোনো ষড়যন্ত্রের কোনো কোনো চক্রান্তের অংশিদার – স্পষ্টই এটা মনের ভুল, কারণ নিশ্চয়ই সেই নাচের আসরের সকলেই কারুর কলের পুতুল ছিলো না, কেউ তাদের সুতো টেনে-টেনে নাচায়নি নিশ্চয়ই। আমি কথা বললুম বুড়োদের সঙ্গে, কথা বললুম আমার রূপ দেখে ঈর্ষাতুর তরুণীদের সঙ্গে; কত অগুনতি ধরনের মূর্খতার ছায়া যে দেখেছিলুম — দু-রকমই, অনিচ্ছাকৃত ও সহৃদয়, আর অসূয়াপর ও বিদ্বেষময়; এইসব হাবাগোবা জবুথবুদের আর ঠোঁটফোলানো কুমারীদের আমি এতই অনায়াসে ছিঁড়ে-চিরে দিচ্ছিলুম যে শেষটায় তাদের জন্য একটু কষ্টই হচ্ছিলো। আমি যেন বুদ্ধির তীক্ষ্ণ দীপ্তি, প্রখর হ'য়ে উঠেছিলো আমার পরিহাসবোধ, আমার কথার ঝলমলে ক্ষিপ্রতায় ঝকমক ক'রে উঠছিলো আমার চোখ – আমার ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মধ্যে আরহোডেসকে বাঁচাবার জন্য আমি সানন্দে তাকে ঢালের মতো আড়াল ক'রে রাখতে পারতুম, কিন্তু কেবল এই একটা কাজই আমি করতে পারিনি। দুঃখের বিষয় যে আমার বহুমুখী প্রতিভা ততদূর পর্যন্ত পৌঁছোয়নি। তাহ'লে কি আমার বুদ্ধি (আর বুদ্ধি তো অখণ্ডতারই স্মারক) কোনো মিথ্যার অধীন? নাচতে-নাচতে এইসব কথাই ভাবছিলুম আমি, যখন পাক খাচ্ছিলুম মিনুয়েটের তালে-তালে; আর আরহোডেস – সে একবারও নাচেনি — দূর থেকে আমাকে লক্ষ ক'রে যাচ্ছিলো, মুকুটপরা সিংহশোভিত কিংখাবের লাল পর্দার পটে কালো আর লম্বা। রাজা হলঘর ছেড়ে চ'লে গেলেন; তার একটু পরেই আমরাও বিদায় নিলুম। আমি তাকে কোনো কথা বলবারই সুযোগ দিইনি, কোনো আমন্ত্রণ জানাবার অবকাশ দিইনি; সে চেষ্টা করেছিলো, পাণ্ডুর হ'য়ে গিয়েছিলো, কিন্তু প্রথমে আমি মুখ ফুটে আস্তে বলেছিলুম 'না', তারপর সেই ভাঁজ-করা পাখা নেড়ে আবারও

জানিয়েছিলুম 'না'। বেরিয়ে এলুম আমি বাইরে, কোথায় যে থাকি তার কোনো ধারণাই নেই আমার : কোথেকে আমি এসেছি, কোনদিকে যাবো কিছুই জানা নেই, শুধু এটুকু জানি যে এ-সব প্রশ্নের উত্তর আমার নিজের ওপর নির্ভর করে না; ভাববার চেষ্টা করেছিলুম সত্যি, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি—কেমন ক'রে এই অবস্থাটা বোঝাবো আমি? সবাই জানে যে চোখের মণি ঘুরিয়ে কেউ মাথার খুলির মধ্যেটায় তাকিয়ে দেখতে পারে না—কিছুতেই তা সম্ভব নয়।

প্রাসাদের ফটক পর্যন্ত আমার সঙ্গে তাকে আসতে দিলুম আমি। সারি-সারি জ্বলন্ত পাত্র ঝুলছে দুর্গবীথিকার বৃত্ত পর্যন্ত; ঠাণ্ডা হাওয়ায় সুদূর, অমানুষিক, কোনো হাসির শব্দ উচ্ছল ভেসে আসছে, দক্ষিণদেশের প্রভুদের বীথিকার ফোয়ারাগুলোর এক মুক্তোঝলশানো অনুকরণ—অথবা পুষ্পকুঞ্জের পাশে সারি-সারি প্রস্তরমূর্তির উন্মুখর ছায়াঢাকা প্রেতের কণ্ঠস্বর হবে বুঝি; আর গান গাইছিলো রাজোদ্যানের নাইটিঙ্গেলগুলো, যদিও কেউ শুনছিলো না তাদের গান; উষ্ণমণ্ডলের ফুলগুলোর জন্য যে কাচের ঘর বানানো হয়েছিলো তার কাছে গোল চাঁদের পটে বসেছিলো এক নাইটিঙ্গেল—জলের ওপর মস্ত আর কালো—কোনো প্রতিভাবানের গল্পের মতো সুঠাম তার ভঙ্গি। আমাদের পায়ের তলায় শব্দ ক'রে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিলো নুড়িপাথর, আর ভেজা লতাপাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিলো বীথিকার বেড়ার সোনালি ফলকগুলো।

অধীর আগ্রহে, একটু যেন রাগ ক'রেই, সে আমার হাত চেপে ধরলে; তক্ষুনি হাত সরিয়ে নিইনি আমি; রাজার প্রহরীদের উর্দির গায়ে শাদা ডোরাগুলো ঝিলিক দিয়ে উঠলো; কে একজন আমার কোচবাক্সটাকে ডাক দিলে; ঘোড়ার খুরের শব্দ হ'লো খট-খট; বেগুনি লণ্ঠনের আলোয় কোচবাক্সের দরজা ঝলমল ক'রে উঠলো; দরজা থেকে নেমে এলো সিঁড়ির ধাপ। না, এটা কোনোমতেই স্বপ্ন হ'তে পারে না।

'কখন? কোথায়?' সে জিগেশ করলে।

'বরং বলা ভালো: কখনও না, কোথাও না,' আমি বললুম, আমার সরল সত্যটিকে খুলে বললুম আমি; কিন্তু পরক্ষণেই জুড়ে দিলুম, অসহায়ভাবে: 'আপনাকে নিয়ে আমি খেলা করিনি, দার্শনিকপ্রবর, নিজের

ভেতরটায় তাকিয়ে দেখুন, দেখবেন যে আমি সৎ পরামর্শই দিয়েছি।'

কিন্তু যা আমি বলতে চাচ্ছিলুম তা মুখ ফুটে বেরুলো না। আমি ভাবতে পারছিলুম সবই, কিন্তু যতই আশ্চর্য ঠেকুক, কিছুতেই আমার স্বর খুঁজে পেলুম না, ঐ কথাগুলোর কাছে পৌঁছুতেই পারলুম না। গলা ধ'রে এলো কেমন, যেন বোবা হ'য়ে গেছে স্বর, যেন তালার মধ্যে ঘুরে গেলো চাবি, যেন ছিটকিনি নেমে এলো দুজনের মধ্যে।

'দেরি হ'য়ে গেছে,' আস্তে, খুব নরম স্বরে সে বললে, মাথা নামিয়ে। 'সত্যি বড্ড দেরি হ'য়ে গেছে।'

'সকাল থেকেই খোলা থাকে রাজোদ্যানগুলো—দুপুরবেলার শিঙা বাজা অব্দি,' সিঁড়ির ধাপে পা ফেলে আমি বললুম, 'ওখানে একটা দিঘি আছে, রাজহাঁস ভাসে, একটা মরা ওকগাছ আছে কাছে। কাল ঠিক দুপুরবেলায়, কিংবা ঐ ওকগাছের কোটরে, আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পাবেন। আর এখন আমি সত্যি মনে-প্রাণে কামনা করছি যদি কোনো অচিন্তনীয় দৈবদয়ায় আপনি এটা ভুলে যেতে পারেন যে আমাদের দুজনের কখনো দেখা হয়েছিলো। কেমন ক'রে তা করা যেতো জানলে আমি এই প্রার্থনাই করতুম।'

একেবারেই অনুপযোগী এই কথাগুলো, বিশেষত এই পরিবেশে একেবারেই বেমানান আর তুচ্ছ আর অনর্থক, কিন্তু এখন তো আর এই মারাত্মক গতানুগতিকতা ভেঙে বেরুবার উপায় নেই আমার। কোচবাক্স চলতে শুরু করার সঙ্গে-সঙ্গে আমি বুঝতে পারলুম সে তো, সত্যি, এই কথাগুলোর অন্যরকম মানে করতে পারে, সে তো ভাবতে পারে যে সে আমার মধ্যে যে আবেগের ঢেউ তুলেছে আমি তাকেই ভয় পাচ্ছি। আর তা তো সত্যি কথাই: সে আমার মধ্যে যে-অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছে আমি তাকে ভয় পাই: অথচ তার সঙ্গে প্রেমের কোনো সম্পর্কই নেই; আমি তাকে শুধু তা-ই বলতে পেরেছি, 'যা আমি বলতে সক্ষম হয়েছিলুম,' যেমন ক'রে অন্ধকারে, জলাভূমিতে, চোরাবালিতে, খুব সাবধানে কেউ পা বাড়ায়, এই ভয়ে যে যদি পরের মুহূর্তেই ডুবে যায় গভীর জলে। এইভাবেই ঐ কথাগুলোয় পথ হাৎড়েছিলুম আমি, আমার শ্বাসে-প্রশ্বাসে বুঝতে চেয়েছিলুম কী আমি বলতে পারি আর কী বলার কোনো অনুমতি নেই।

কিন্তু সে তো তা জানবে না। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি আমরা রুদ্ধশ্বাসে, ঠিক তীব্র প্রেমের মতোই এক আতঙ্কে, কারণ এইভাবেই শুরু হয়েছিলো আমাদের সর্বনাশ। কিন্তু আমি, কমনীয়, লাবণ্যময়, কম্পমান, কাঙ্ক্ষিতা, সদ্যোযুবতী. আমি ঢের স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলুম যে আমিই তার নিয়তি ; নিয়তি, অর্থাৎ তার অপ্রতিরোধ্য সর্বনাশ।

কোচবাক্সের ভেতরটা ফাঁকা। কোচোয়ানের আস্তিনে নিশ্চয়ই প্রতীক-আঁটা ঝালর আছে—কিন্তু না, নেই। জানলাও নেই কোচবাক্সে—কালো কাচ বসানো, তাহ'লে ? ভেতরের অন্ধকার অখণ্ড, সম্পূর্ণ, আর তা যেন রাত্রি ব'লে নয়, বরং নিরস্তিত্বেরই প্রমাণ হিশেবে। এই অন্ধকার নয় আলোহীনতার, বরং শূন্যতার। জমকালো সাজানো দেয়ালের বক্ররেখার ওপর হাত বুলিয়ে গেলুম আমি, কিন্তু না আবিষ্কার করতে পারলুম জানলার কাঠামো, না-বা কোনো হাতল, শুধু নরম কুশন বসানো উপরিতল – আমার সামনে, আমার মাথার ওপর ; ছাতটা খুবই নিচু, যেন আমি কোনো বন্ধ কোচবাক্সে নেই, বরং কোনো কম্পমান গড়ানো আধারের মধ্যে আমাকে আটকে রাখা হয়েছে ; কানে এলো না ঘোড়ার খুরের শব্দ, কিংবা চলন্ত চাকার ঘর্ঘর। অন্ধকার, স্তব্ধতা, আর তাছাড়া আর-কিছুই নেই। তারপর আমি নিজের দিকে তাকালুম, কারণ আমার আমিত্ব আমার কাছে এ পর্যন্ত যা-যা ঘটেছে তার মধ্যে সবচেয়ে অন্ধকার সবচেয়ে ভয়াবহ রহস্য, সবচেয়ে মারাত্মক প্রহেলিকা। আমার স্মৃতি অটুট আছে। বোধহয় এইরকমই তার হবার কথা, বোধহয় অন্যকোনোভাবে তার বিন্যাস বা ব্যবস্থা করাই যেতো না, আর সেইজন্যেই আমি মনে করবার চেষ্টা করলুম আমার প্রথম জাগরণের মুহূর্তটি, যখন আমি মোটেই জানিনি আমি নারী না পুরুষ, আর এত অচেনা লাগলো সেই মুহূর্তটিকে যে মনে হ'লো আমি কোনো অলুক্ষুণে রূপান্তরের স্বপ্নকে মনে করার চেষ্টা করছি। মনে পড়লো জেগে উঠেছিলুম হলঘরের সামনে প্রাসাদদুয়ারে, এই বর্তমান বাস্তবতার মধ্যে সেই তখনই আমি এসে পড়েছি, এমনকী মনে ক'রে নিতে পারলুম সেই অস্ফুট ধ্বনিগুলো যার মধ্যে দিয়ে সেই বাঁকানো দুয়ার আর খিলেনগুলো খুলে

গিয়েছিলো, আর ভৃত্যের মুখের সেই মুখোশ, যে-ভৃত্য সেবা করার উৎসাহে ছিলো শুধু নম্রতায় ভরা কোনো পুতুলের মতো—মোমের পুতুলের এক জীবন্ত খোলশ। এই সবকিছুই আমার মনের মধ্যে সুতো দিয়ে গাঁথা, তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই বিন্যাসের কোনো সামঞ্জস্য আছে, অর্থ আছে ; আর এখনও আমি ফিরে যেতে পারি সেই পেছনে, যেখানে আমি মোটেও জানিনে কিসের সেই খিলান, সে-কাকে বলে বলনাচের আসর, আর কাকেই বা বলে—'আমি'। আর বিশেষভাবে মনে পড়লো—আর মনে ক'রে শিউরে উঠলুম—এত অলুক্ষুণেভাবে তা রহস্যময়—যে আমার প্রথম ভাবনাগুলো দিয়ে—তখনি একটু-একটু ক'রে ভাষায় তারা রূপ পাচ্ছে—আমি মনে-মনে দানা বাঁধিয়েছিলুম এক নৈর্ব্যক্তিক ধরন—নারীত্বহীন পুরুষত্বহীন এক নৈর্ব্যক্তিকতা। সেই-বস্তু-যে-'আমি' দাঁড়িয়েছিলো, সেই-আমি যে দেখেছিলো, আমি/সে—ঢুকেছিলুম/ঢুকেছিলো—এই সব ভাবনাই খেলে গিয়েছিলো আমার মধ্যে হলঘরের সেই ঝলোমলো মুহূর্তের আগে, স্রোতের মতো ব'য়ে গিয়েছিলো কোনো খোলা দুয়ার দিয়ে, আমার চোখের তারায় আঘাত করেছিলো হঠাৎ আলোর ঝলকানি, আর চাবি খুলে দিয়েছিলো - আলোর ঝলকই হবে নিশ্চয়ই, তাছাড়া আর কীই বা হ'তে পারে—আর আমার মধ্যে খুলে গিয়েছিলো ছিটকিনি আর খিল, আর আড়াল ভেঙে ফেটে পড়েছিলো আমার মধ্যে, কোনো অতর্কিত সাক্ষাতের মতো বেদনাময়, কথার পর কথা, কথার মানবিকতা, পারিষদদের চলন-বলন, নারীদের মোহিনী মায়া, আর স্মৃতি—মুখের স্মৃতি, আর তার মধ্যে সেই পুরুষটির মুখের স্মৃতিই ছিলো সবচেয়ে প্রখর—না, রাজকীয় ভ্রূকুটির স্মৃতি নয় - আর যদিও কেউ কোনোদিনও আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারবে না, তবু আমি অটলভাবে জানি যে রাজার সামনে আমি যে দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম তা নেহাৎই আচমকা, ভুল ক'রে ; আমার যা বিধিলিপি আর সেই নিয়তির যে যন্ত্রী - তার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিলো ব'লেই তা ঘটেছিলো। বিভ্রম ? ভ্রান্তি ? ভুল ? কিন্তু কোন সেই নিয়তি, যে ভুল করে ? কোনো সত্যিকার নিয়তি নিশ্চয়ই নয়। তাহ'লে কি এখনও আমি নিজেকে বাঁচাতে পারি ?

আর এখন এই নিখুঁত সুঠাম নিঃসঙ্গতায়—না, আমি তাকে ভয় পাইনি,

বরং তাকে আমার সুবিধেজনকই ঠেকেছিলো, কারণ এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে আমি ভাবতে পারি, মন বসাতে পারি, যখন আমি নিজেকে জানবার চেষ্টা করি, আর আমার স্মৃতির মধ্যে ব্যাকুলভাবে হাৎড়াই, তখন তাদের কী সহজগম্য ঠেকে, কী পরিচ্ছন্নভাবে সুবিন্যস্ত ঠেকে, যে আমার কাছে তারা কোনো পুরোনো ঘরের অতি-চেনা আশবাবের মতো, আর যখন প্রশ্ন করি আমি, প্রশ্নের পর প্রশ্ন, দেখতে পাই সে-রাতে কী-কী ঘ'টে গেছে পর-পর, কিন্তু শুধু হলঘরের চৌকাঠের কাছ থেকেই তারা স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ, আর তার আগে—হ্যাঁ, ঠিক তাই! কোথায় ছিলুম আমি/সে/ঐ বস্তু—তার আগে? কোনখান থেকে এসেছি 'আমি'—? সবচেয়ে সহজ, সবচেয়ে আশ্বাসভরা উত্তর হ'লো যে আমি নিশ্চয়ই পুরোপুরি সুস্থ নই, যে আমি নিশ্চয়ই কোনো ভীষণ অসুখ থেকে সেরে উঠছি—যেন সব রুদ্ধশ্বাস রগরগে অবিশ্বাস্য অ্যাডভেনচারে ভরা এক উদ্ভট সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরে আসছি; যে অতিমার্জিত ও পরিশীলিত তরুণী কুমারী আমি, বই, রোমান্স, দিবাস্বপ্ন আর খামখেয়ালে-ভরা, এই বন্য ভীষণ জগতের উপযোগী নই এমন-এক পেলব ও নমনীয় তরুণী, যে আমি বোধহয় ভুল দেখেছি চোখের সামনে, মৃগীরোগের বিকারের ঘোরে, যে ঐ ধাতব নরকের গোলকধাঁধা আসলে বিকারেরই লক্ষণ, সন্দেহ নেই যে চাঁদোয়া-ঢাকা বিছানায়, লেসকাটা শুজনির ওপর শুয়ে…হ্যাঁ, হ্যাঁ, মস্তিষ্কবিকারই হবে নিশ্চয়ই, সেই জন্যই ছিলো মোমবাতির নরম আলো, ঘরটা আধোছায়া আধো-আলোয় ভরা, যাতে প্রলাপের মধ্য থেকে জেগে উঠে আমি আবার ভয় পেয়ে সংবিৎ না-হারাই, আর যে-মুখগুলো দেখেছিলুম আমার ওপর ঝুঁকে আছে তারা আসলে নিশ্চয়ই আমারই স্নেহাতুর অভিভাবক। কী মধুর মিথ্যা! বিকারের ঘোরে অলীক সব দৃশ্য দেখেছি আমি, দেখিনি কি? আর তারা, আমার একক স্মৃতির স্বচ্ছ প্রবাহে ডুবে গিয়ে, দু-টুকরো ক'রে দিয়েছে তাকে। টুকরো-হওয়া স্মৃতি…? কারণ এ-প্রশ্নটা করবামাত্র আমি আমার মধ্যে উত্তরের সমস্বর ঐকতান শুনতে পেলুম, প্রস্তুত, অপেক্ষমাণ, সোৎসাহ: ডিউকদুহিতা, রানীর সহচরী, টেলেনিক্স, আন্‌জেলিতা। অ্যাঁ, এটা কি? এই সবকটি কথা তৈরি পেয়েছি আমি, আমার কাছে দেয়া হয়েছে এই কথাগুলো, আর প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে

এসেছে যথাযথ ও সুমানান চিত্রকল্প ; যদি শুধু তাদের গ্রথিত করার মতো কোনো-একটা মাত্র শৃঙ্খল থাকতো ! কিন্তু তারা একসঙ্গে বেঁচে আছে, যেমনভাবে সহাবস্থান করে কোনো গাছের ছড়িয়ে-পড়া সব শিকড় ; কাজেই তাহ'লে আমি—আসলে এক, স্বভাবত অদ্বিতীয় ; তবে কি আমার কখনো ছিলো শাখাপ্রশাখার বহুত্ব, ডালপালার অনেক রূপ—যারা তারপরে আমার মধ্যে মিশে গিয়েছে যেমনভাবে নদীর স্রোতে মিশে যায় অনেক ঝরনার জল ? কিন্তু তেমন-কিছু তো একেবারেই অসম্ভব। অসম্ভব—নিজেকে আমি বললুম। এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই নেই। আর দেখতে পেলুম এ-যাবৎ আমার জীবন এইভাবে দু-টুকরো হ'য়ে আছে : প্রাসাদের সেই হলঘরের দেহলির আগে পর্যন্ত আমার জীবন ছিলো অনেক সুতোর বুনুনি, আর চৌকাঠ পেরুবার পরেই সব এক হ'য়ে মিশে গেছে। আমার জীবনের-প্রথম ভাসা যে-সব দৃশ্যে তৈরি তারা পরস্পরের সমান্তর, তারা একে-অন্যকে অস্বীকার করে। ডিউকদুহিতা : রানীর সহচরী : একটা মস্ত কেল্লা, কালো গ্র্যানাইট পাথরের থাম, পরিখার ওপর শব্দ ক'রে নামে সেতু, রাত্রে কোলাহল শোনা যায়, তামার পাত্রে রক্ত, কশাইয়ের মতো সব যোদ্ধাপুরুষ, যুদ্ধকুঠারের জংধরা হাতল, আর আমার পাণ্ডুর ছোট্ট মুখ, জানলার গোল কাচের কাঠামোয় আঁটা, কুয়াশাঢাকা, ধূসর, গম্বুজের বক্ররেখা – আমি কি সেখান থেকে এসেছি ?

অথচ আন্‌জেলিতা হিশেবে আমি বড়ো হয়েছি দক্ষিণ দেশের ভাঁপশা গরমে, আর সেদিকে তাকিয়ে আমি দেখতে পেলুম শাদা সব দেয়াল তাদের চুনসুরকির পিঠ মেলে রোদ পোহাচ্ছে, শুকিয়ে-যাওয়া সব তালগাছ, আর তার আশপাশে লোমঝরা রুক্ষ সব বন্য কুকুর, ঠ্যাং তুলে তারা তালগাছের জড়ুল-আঁকা গুঁড়িতে প্রস্রাব করছে, ঝুড়ি-ঝুড়ি খেজুর রোদে জারানো, মিষ্টি, সবুজ কুর্তা গায়ে সব চিকিৎসক, আর সিঁড়ি, ধাপে-ধাপে নেমে গেছে পাথরের সিঁড়ি, শহর থেকে উপসাগরে, সব দেয়াল পিঠ ফিরিয়ে থাকতে চায় গরমের হলকা থেকে, স্তূপ-করা আঙুরের খোলো, শুকিয়ে হলদে হ'য়ে যাচ্ছে কিশমিশে, দূর থেকে দেখায় গোবরের স্তূপের মতো, আর আবার আমার মুখ, এবার জলে ভাসছে, কাচের ফ্রেম থেকে তাকিয়ে নেই, আর রুপোর কলস থেকে জল ঝরছে ঝর্‌ঝর—

রুপোর কলস, কিন্তু বয়সের ভারে কালো। আমার এমনকী মনে প'ড়ে গেলো কেমনভাবে কাঁখে ক'রে যেতুম আমি ঐ কলস, আর জল, ভারি জল, ন'ড়ে উঠতো তার ভেতর, আর উপচে পড়তো আমার হাতে।

আর সে তবে কে—আমার সেই সত্তা, যে নারীও নয়, পুরুষও নয়? তার বেলায় কী হবে, সেই-যে সত্তা শুয়েছিলো চিৎপাত, তার অভিযাত্রায়, আর আমার হাতে-পায়ে-কপালে সেই-যে ছোটো-ছোটো চুমু খেয়েছিলো ধাতুর তৈরি সব সাপ? সেই বিভীষিকা এখন পুরোপুরি মিলিয়ে গেছে, আর হাজার চেষ্টা ক'রেও এখন তাকে আমি প্রায় মনেই করতে পারি না—ঠিক যেমন এক দুঃস্বপ্ন, যাকে কথায় ব'লে প্রকাশ করা যায় না। না, অসম্ভব, এমন-সব বিপরীত জীবন—সে একসঙ্গেই হোক, বা পর-পরই ঘ'টে থাকুক—আমার পক্ষে ভোগ করা সম্ভব নয়! কী তাহ'লে সুনিশ্চিত? আমি সুন্দরী। একই সঙ্গে তুমুল নৈরাশ্য আর আশ্চর্য বিজয়ের অনুভূতি আমার মধ্যে আলোড়ন তুলেছিলো, যখন তার চোখে আমি ফুটে উঠতে দেখেছিলুম নিজেকে—সে যেন ছিলো কোনো জীবন্ত আয়না, কারণ আমার সব অঙ্গে-অঙ্গে এমনই ছিলো সুষমা, এমন ত্রুটিহীন, এমন লাবণ্যময়, যে আমি যা-খুশি তা-ই করতে পারতুম, যেমন-খুশি উন্মত্ততা, মুখে ফেনা তুলে ডুকরে উঠতে পারতুম কিংবা চিবিয়ে খেতে পারতুম লাল মাংস, কিন্তু তবু আমার মুখ থেকে রূপ অপসৃত হ'তো না - কিন্তু কেন আমি ভাবলুম 'আমার মুখ,' কেন নয় সোজাসুজি 'আমি'? তবে কি আমি এমন-কেউ যে তার নিজের শরীর আর মুখের সঙ্গে কোনোরকম বিচ্ছেদ বা অস্বস্তিতে ভুগছে, তার কি তবে মন পোড়ায় শরীরটাকে নিয়ে, সে কি তবে নিজের শরীরের সঙ্গে অসমঞ্জস এক অবস্থায় আছে? কোনো ডাইনি যে এক্ষুনি ইন্দ্রজাল ছড়াবে, কোনো নিদয়া মেদেয়া? একেবারে বাজে কথা, হাস্যকর! আর এই-যে তথ্য, আমার মন এই-যেভাবে কোনো বদমায়েশ যোদ্ধার হাতের তলোয়ারের মতো চর্কি খেলছে, যে আমি অবলীলাক্রমে সবকিছু কেটে-চিরে টুকরো-টুকরো ক'রে ফেলছি, আমার এই স্বনির্ভর চিন্তার ক্ষমতা এতই সঠিক যে মনে হয় একটু যেন হিমশীতল, যেন বড্ড বেশি শান্ত, কারণ তার আড়ালেই তো ওঁৎ পেতে আছে ভয়—যেন কোনো স্বতঃপ্রমাণ সর্ববিসারী অথচ বিচ্ছিন্ন কিছু—আর সেই জন্যেই আমার এই ভাবনাগুলোকেও আমি সন্দেহ করতে

লাগলুম। কিন্তু যদি কাউকেই আমি বিশ্বাস করতে না-পারি, মনকেও না, মুখকেও না. তাহ'লে সত্যি কার বিরুদ্ধে আমার এত সন্দেহ আর ভয়, কারণ এটা তো ঠিক দেহ আর মনের পরপারে আর-কিছুই কারু নেই! আর এটা কেমন যেন বিমূঢ় ক'রে দিলে আমাকে।

আমার বিভিন্ন অতীতের বিশৃঙ্খল শিকড়গুলো আমাকে কোনো জরুরি কথাই জানালো না: শুধু তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলুম ঝলমলে সব চিত্রকল্প, সচল. পরিবর্তমান, দূরগামী — এই একবার দেখলুম উত্তর দেশের রানীর সহচরী ডিউকদুহিতাকে. আরেকবার রৌদ্রজ্বলা দক্ষিণের আন্‌জেলিতাকে আবার পরক্ষনেই মিননকে, প্রত্যেকবার আমি হ'য়ে উঠলুম অন্য-কেউ, অন্য নাম, অন্য কাজ, অন্য বংশপরিচয়, সবসময়েই অন্য আকাশের তলায় — কে যে আগে. কে যে পরে, তার কোনো ঠিক নেই — দক্ষিণদেশের রৌদ্রজ্বলা দৃশ্য যে বারে-বারে ফিরে আসছে চোখের সামনে, মাধুর্যভরা, লাবণ্যময়, সে শুধু প্রতিতুলনা হিশেবেই, এমন উজ্জ্বল রঙ, নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত, যদি ঐ হাড়-জিরজিরে ঘায়েভরা কুকুরগুলো না-থাকতো, আর যদি না-থাকতো অর্ধেক-অন্ধ ছেলেমেয়েগুলোর পিঁচুটিভরা চোখ আর ফুলে-ওঠা প্লীহা, তাদের ঘোমটাঢাকা মায়ের কোলে যারা চুপচাপ ম'রে যাচ্ছে, তাহ'লে এই তালবনে ঢাকা রৌদ্রজ্বলা সৈকত আমার কাছে মনে হ'তো অতিরিক্ত সাবলীল, কোনো সুপ্রস্তুত সপ্রতিভ মিথ্যাকথার মতো ছিমছাম, মসৃণ। আর রানীর সহচরীর সেই উত্তরাপথ, তার তুষারজমা দুর্গশীর্ষ, ধূসর আকাশ — শিশের মতো ভারি. আর সবই শীতকাল — যখন ঘূর্ণিহাওয়া উদ্ভাবন করে বরফের আঁকাবাঁকা উদ্ভট মূর্তি, যে-সব অস্পষ্ট মূর্তি হানা দেয় পরিখার পাশে, খিলানের ওপর, গম্বুজের মাথায়, দুর্গের সব ফাঁকফোকর দিয়ে তারা বার ক'রে দেয় তাদের লোলুপ ধবল জিহ্বা, আর হলুদ অশ্রুধারার মতো পরিখার সেতুর শৃঙ্খল — কিন্তু আসলে জংধরা শেকলের ওপর জ'মে আছে তুষারঝুরি, আর সব গ্রীষ্মকাল — যখন পরিখার জলে ভেসে থাকে ভেড়ার লোমের মতো শ্যাওলা আর জলের উদ্ভিদ: আর এইসব — কী স্পষ্ট — সব আমার মনে আছে!

কিন্তু আমার তৃতীয় অস্তিত্ব; সেই বীথিকাগুলো, বিপুল, শীতল, সযত্ন-সাধিত; কাঁচি হাতে সব মালিরা, শিকারি কুকুরের ঝাঁক, সিংহাসনের

সিঁড়ির তলায় সেই রংচঙে গ্রেট ডেন—যেন কোনো উদাসীন পাথরের মূর্তি, যার নিশ্বাসের তালে-তালে ন'ড়ে উঠেছে পাঁজর, আর জড়তার নির্ভুল সুষমা ফুটে উঠেছে যার দেহে—আর তার হলদে, নিরুৎসুক চোখে ঝকমক ক'রে উঠছে মারার্জার আর দুঙ্কোহলের ছোটো-ছোটো মূর্তি। আর এই কথাগুলো—মারার্জার, দুঙ্কোহল. এখন আমি জানিই না কী তাদের অর্থ, কিন্তু নিশ্চয়ই একদিন জানতুম, আর যখন আমি এই অতীতের মধ্যে ডুব দিই, এত ভালো মনে আছে সব, যে মনে প'ড়ে যায় এমনকী ঘাসের ডগা চিবোবার স্বাদটাও, আমার মনে হয় যে-অতীত আমি ছাপিয়ে উঠেছি সেখানে আমার ফিরে-যাওয়া উচিত হবে না, উচিত হবে না সেই প্রথম লম্বা ঘাঘরাটা পরা, যাতে ছিলো রুপোলি জরির কাজ, যেন যে-শিশুকে আমি লুকিয়ে রাখতে চাই সে ছিলো রাজদ্রোহেরই অন্য নাম। সেইজন্য আমি এমন স্মৃতিকে শমন পাঠালুম যে অমানুষিক নিষ্ঠুর—সে হ'লো এই নিষ্প্রাণ ভ্রমণ, মুখতোলা, ধাতুর পাতের অবশ-করা চুম্বন, আমার নগ্ন দেহ স্পর্শ ক'রে আছে তারা, ঝনঝন ক'রে বেজে উঠছে, যেন আমার নগ্নতা আসলে কোনো কণ্ঠস্বরহীন ঘণ্টা, এমন ঘণ্টা যে এখনো তার কোনো হৃদয় নেই ব'লে তার কোনো জিহ্বা নেই ব'লে ঢং-ঢং ক'রে বেজে উঠতে শেখেনি। হ্যাঁ, এই অসম্ভাব্যতার কাছেই আমি আমার শেষ আর্জি পাঠালুম ; এখন আর বিস্ময় নেই কেন একগুঁয়ের মতো এই প্রলাপেভরা দুঃস্বপ্ন আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে রেখেছে, কারণ দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কীইবা তাকে বলা যায়! আর এই নিশ্চয়তাকে অনুভব করবো ব'লে আমার আঙুলের ডগা দিয়ে আমি স্পর্শ করলুম আমার পেলবকোমল পুরোবাহু, আমার স্তন ; অনধিকার স্পর্শ, সন্দেহ নেই, আর শিহরন জেগে উঠলো শরীরে, যেন আমি মাথা পেছনে হেলিয়ে দাঁড়িয়ে আছি কোনো তুষারহিম বৃষ্টির পুনর্জাগরূক ঝমঝমে ফোঁটার নিচে।

প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর নেই কোথাও। কাজেই আমি ফিরে এলুম সেই দূর পাতাল থেকে যে একই সঙ্গে আমি, আবার আমি নয়। আর এখন আবার এখানে, যা একমাত্র, শুধু এক। রাজা, সান্ধ্য নাচের মজলিশ, সভাসদেরা, আর সেই পুরুষ। তার জন্যেই নির্মিত আমি, আর আমার জন্যে-সে। আমি জানি এই সত্যটা, কিন্তু ভয় ক'রে উঠলো

আবার, না, ভয় নয়. যেন নিয়তির লৌহকঠিন উপস্থিতি, অপ্রতিরোধ্য, অনিবার্য. অভেদ্য, আর এই অনিবার্যতাই, মৃত্যুর সংকেতের মতো ; এই জ্ঞান যে এখন আর কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না, এড়িয়ে যেতে পারবে না, স'রে যেতে পারবে না, পালিয়ে যেতে পারবে না, ধ্বংস হবে. কিন্তু 'ধ্বংস হবার এটাই একমাত্র উপায়' – আর আমি রুদ্ধশ্বাসে সেই রক্তজলকরা উপস্থিতির মধ্যে ডুবে গেলুম। সইতে পারি না আর এই গুরুভার, আমি যে আর বইতে পারি না, আর স্ফুট স্বরে ব'লে উঠলুম ডুকরে উঠলুম, 'বাবা, মা, ভাই. বোন, স্বজন'—কী ভালোই যে জানি আমি এই কথাগুলোর মানে, পর-পর ভিড় ক'রে এলো উৎসুক ইচ্ছুক সব মূর্তি, এরা আমার চেনা, তাদের কাছে জবাবদিহি করতে হ'লো আমাকে, স্বীকার করতে হ'লো হ্যাঁ, কিন্তু কারু নিশ্চয়ই চারজন মা হয় না বা চারজন বাবা, আর তার মানেই আবার এই বিকার এই প্রলাপ, এই উন্মত্ততা ? এত হাঁদা আর এত জেদি ?

আমি অঙ্কের আশ্রয় নিলুম : এক আর একে দুই, এক বাবা আর এক মায়ের কাছ থেকে আসে শিশু, তুমি সেই শিশু, তোমার আছে সেই ছেলেবেলার দিনগুলির স্মৃতি ··

হয় আমি পাগল হ'য়ে গিয়েছিলুম, আমি বারে-বারে বললুম নিজেকে, নয়তো এখনও পাগল হ'য়েই আছি, আর মন – তাকে যেন কোনো দারুণ রাহু সম্পূর্ণ গ্রাস ক'রে ব'সে আছে। সেই গ্রহণলাগা মনে নেই কোনো বল-নাচের আসর, নেই কোনো প্রাসাদ, নেই কোনো রাজা, নেই অনিঃশেষ সামঞ্জস্যের বিধিনিষেধের মধ্যে জেগে-ওঠা। ছুরির মতো বিঁধে গেলো অনুশোচনা, মনস্তাপ ; আমার এই রূপ আমাকে ছেড়ে চ'লে যেতে হবে, এই বোধের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ জেগে উঠলো। পরস্পরবিরোধী সব উপাদান থেকে কিছুই তো আমি নিজের ক'রে রচনা করতে পারবো না, যদি-না এইসব উপাদানের মধ্যেই নিহিত থাকে কোনো গূঢ় বিন্যাস, উলটোপালটা বা রহস্যময় যদি হয় হোক না, তবু কোথাও আছে নিশ্চয়ই কোনো সুশৃঙ্খল সজ্জা, আর তার জোড়াগুলো খুলে ফেলতে হবে আমাকে ভেদ করতে হবে আড়াল, যাতে কাঠামোটা খুলে দেখতে পারি, পৌঁছুতে পারি মূলে, একেবারে অন্তঃস্তলে। যেমনভাবে হবার কথা ছিলো তেমনি-

ভাবেই কি হয়েছে সবকিছু? যদি আমি রাজারই সম্পত্তি হই, তাহ'লে আমি তা জানতে পেলুম কীভাবে? নিশ্চয়ই নিশুত রাতের অন্ধকারেও এ নিয়ে মনে-মনে নাড়াচাড়া করা তাহ'লে নিষিদ্ধ হ'তো। যদি তিনিই থাকেন সবকিছুর পিছনে, তাহ'লে কেন আমি প্রথমে প্রত্যাখ্যান ক'রে পরে তাঁকে সম্ভ্রমভরে কুর্নিশ করতে গিয়েছিলুম? যদি প্রস্তুতিতে কোনোই ভুল না-থেকে থাকে, তাহ'লে এমন-সব বিষয় কেন আমি মনে করতে পারি, যা মনে করা আমার মোটেই উচিত নয়? কারণ, নিশ্চয়ই, শুধু-কোনো মেয়েমানুষের অতীতই যদি থাকতো আমার, তাহ'লে আমি এমন অনিশ্চয়তার যন্ত্রণার মধ্যে পড়তুম না, যা এই মরিয়া ভাবটা এনে দিয়েছে আমার মধ্যে, যা নিশ্চয়ই নিয়তির বিরুদ্ধে কারু বিদ্রোহের প্রস্তাবনা। অন্তত আমার অতীত থেকে সেই পরম্পরাটুকু মুছে দেয়া উচিত ছিলো তাদের, আমার নগ্নতার মধ্যে প্রাণ পুরে দেবার আগে যখন আমি শুয়েছিলুম চিৎপাত, অসাড় আর বোবা, আর যখন ফুলকিছিটোনো চুম্বনে সাড়া জেগে উঠেছিলো। কিন্তু তাও তো ঘটেছে, এখন তো সেটাও আমার অতীত। তবে কি পরিকল্পনায় কোনো ভুল ছিলো, কোনো ভুল ছিলো পরিকল্পনা-মতো কাজ সম্পাদন করার মধ্যে? অবহেলাজনিত কোনো ভুল? কিছু কি চোখ এড়িয়ে গিয়েছিলো? কোনো গোপন সংযোগ খুলে গিয়েছিলো কি একবার? কোনো হেঁয়ালি বা দুঃস্বপ্ন ব'লে কি তার ব্যাখ্যা করা হয়েছিলো? কিন্তু সেক্ষেত্রে তো আমার আবার আশা করার কারণ আছে। অপেক্ষা করা যায়। অপেক্ষা ক'রে দেখা যায়, কীভাবে এগোয় ঘটনা, দেখা যায় আর-কোনো গরমিল আছে কি না, আর শেষটায় একেই বানিয়ে নেয়া যায় এক তরোয়াল, ব্যবহার করা যায় রাজার বিরুদ্ধে, আমার নিজের বিরুদ্ধে, কিছু এসে যায় না কার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হ'লো এই অসংগতি, শুধু ওপর-থেকে-চাপিয়ে-দেয়া নিয়তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা গেলেই হ'লো। তাহ'লে আত্মসমর্পণ করো এই ইন্দ্রজালের কাছে, সহ্য করো একে, সকাল হ'তে-না-হ'তেই চ'লে যাও আদিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে, আর আমি তো জানি, কেন বা কেমন ক'রে তা না-বুঝেও জানি, যে সে-কাজ করা থেকে আমাকে কেউ নিরস্ত করতে পারবে না, বরং, সবকিছুই, আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে ঠিক তারই দিকে। আর আমার এই তাৎক্ষণিক

পরিবেশ, এখানে, এই মুহূর্তে, এতই আদিম যে তাক লাগিয়ে দেয়, হ্যাঁ, এই দেয়াল, এই নমনীয় কাঠামো, প্রথমে আঙুলের ডগায় নরম ঠেকে, অথচ পরক্ষণেই টের পাওয়া যায় এই মখমলের জাজিমের তলায় আছে ইস্পাত কিংবা কংক্রিট, জানি না কী, কিন্তু নখ দিয়ে আঁচড়ে-আঁচড়ে আমি ছিঁড়ে ফেলতে পারতুম এই আরামপ্রদ কোমলতা: আমি উঠে দাঁড়ালুম আর আমার মাথা ঠুকে গেলো ছাতের অবতল বক্রতায়। এই তাহ'লে আমার চারপাশ, আর আমার ওপরে – কিন্তু ভেতরে – শুধু কি আমি, একা আমি?

নিজেকে মোটেই বুঝতে না-পারার এই অলুক্ষুণে অক্ষমতাটা আমি অবিশ্রাম খুলে-খুলে পরীক্ষা ক'রে দেখতে লাগলুম। আর যেহেতু স্তরে-স্তরে নানারকম এলোমেলো ভাবনা ভিড় ক'রে এলো, একটার ওপর আরেকটা, আমি শেষটায় ভাবতে শুরু করলুম আমার নিজের বিচারবোধকে বিশ্বাস করা আমার পক্ষে ঠিক হবে কি না, যেন মধুর উপর আটকে আছি এক অসহায় মৌমাছি, বন্দী হ'য়ে আছি আমার নিজেরই ক্ষরণে, এটা তো স্বাভাবিকই যে আমি –

দাঁড়াও, এক মিনিট। কোথেকে এলো এরা, এই আমার পরিশীলিত সুমার্জিত কথাগুলো, এই সুশিক্ষিত সব চিন্তার ধরন, তৎসম শব্দ, সমাসবহুল, যুক্তিতেভরা সব বাগ্বিধি, ও তর্কের শিলাময় বিন্যাস, কোনো তরুণ মধুর বালিকার মধ্যে এই সাবলীল অথচ জটিল বাক্যের বিন্যাস কি অস্বাভাবিক নয় – তা কি আসলে কোনো জ্বলন্ত ও সজাগ পুরুষ মস্তিষ্কেই বেশি মানাতো না? আর কোত্থেকে এলো যৌন বিষয়ে আমার এই বিরক্তিকর একঘেয়েমির বোধ? কোত্থেকে এলো যৌন বিষয়ে এই হিম বীতস্পৃহা, এই দুরধিগম্য দূরত্ব? ও হ্যাঁ, সে হয়তো আমাকে এর মধ্যেই ভালোবেসে ফেলেছে, হয়তো আমাকে নিয়ে এর মধ্যেই সে পাগল হ'য়ে উঠেছে, আমাকে চোখে না-দেখে আর হয়তো কোনো উপায় নেই তার, কোনো উপায় নেই আমার গলার স্বর না-শুনে, আমার আঙুল ছুঁয়ে না-দেখে – অথচ আমি কি না তার এই সংরক্ত আবেগের দিকে তাকিয়ে আছি যেমনভাবে কেউ তাকায় অনুবীক্ষণের তলায় কোনো স্লাইডের দিকে! একি বিস্ময়কর নয়, স্ববিরোধী নয়, অস্বাভাবিক নয়? না কি আমিই সব কল্পনা ক'রে নিচ্ছি? কল্পনা করছি এই চূড়ান্ত বাস্তবতাকে যে এটা হ'লো কোনো পুরোনো, আবেগ-

বিরহিত মগজ—অসংখ্য বছরের অসংখ্য অভিজ্ঞতায় তালগোল পাকিয়ে যাওয়া? হয়তো আমার একমাত্র ও প্রকৃত অতীত হ'লো কোনো তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি, হয়তো আমি উত্থিত হয়েছি তর্কের অবিচল শৃঙ্খলা থেক, আর তর্কের এই অনড় অটুট যুক্তিপরম্পরাই হ'লো আমার একমাত্র বংশ-পরিচয়...

আমি একে বিশ্বাস করিনি। আমি সরলা, অপাপবিদ্ধা, অথচ একই সঙ্গে তীব্র পাপবোধে ভারাতুরা। সময়ের সব পায়েচলার পথে পাপের কোনো চিহ্ন নেই—অথচ ঘটমান-অতীত মিশে যাচ্ছে আমার বর্তমানের মধ্যে; যেন কোনো বাচ্চা মেয়ে এক ছাইরঙা শীতের দিনে প্রাসাদের দম-আটকানো পরিবেশে গম্ভীর আর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে—একই রকম নিষ্পাপ, যেমন ঘটলো আজকে, রাজার সঙ্গে, কারণ আমি তো আমিই, তা ছাড়া তো আর-কেউ নই; আমার পাপ—আমার বীভৎস পাপবোধ—শুধু এরই মধ্যে ওতপ্রোত যে আমি এত ভালো জানি সবকিছু অথচ তবু তাকে ভাবতে চাচ্ছি অলীক, প্রতারক, নিছক মায়া, কোনো তাৎক্ষণিক বুদ্বুদ হিশেবে—আর আমার রহস্যের তলায় পৌঁছুতে চেয়ে ভেতরে-ভেতরে আসলে ভয় পাচ্ছি পতনকে, আর আসলে অদৃশ্য বাধাগুলোর জন্য দুর্লঙ্ঘ্য দেয়ালগুলোর জন্য ভেতরে-ভেতরে অনুভব করছি নির্লজ্জ এক কৃতজ্ঞতা। তাহ'লে আমার আত্মা একই সঙ্গে কলঙ্কেভরা অথচ নিষ্পাপ? আর কী আছে আমার, তবে? আর কী বাকি রইলো? ও, হ্যাঁ, আরো-কিছু বাকি আছে এখনও, বাকি আছে আমার শরীর; আর আমি ছুঁয়ে দেখতে লাগলুম তাকে, সেই কালো খোঁয়াড়ের মধ্যে পরীক্ষা ক'রে দেখলুম আমি শরীরকে, কোনো দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা যেমনভাবে খুঁটিয়ে দ্যাখে অকুস্থল। সত্যি এক অদ্ভুত তদন্ত—কারণ এই নগ্ন শরীরকে শুধু স্পর্শ দিয়েই তন্নতন্ন ক'রে খুঁজতে গিয়ে আমি আমার আঙুলে কেমন-এক অস্ফুট রোমাঞ্চকর অসাড়ভাব অনুভব করলুম। তা কি তবে আমার নিজেকেই নিজের ভয় পাওয়ারই লক্ষণ? অথচ আমি সুন্দরী, আমার পেশীগুলো নমনীয়, স্থিতিস্থাপক, আর জোড়গুলোও তাই, আর আমার উরুগুলো এমনভাবে আঁকড়ে ধরলুম আমি যেভাবে কেউ নিজের কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরে না, যেন আমার উরু দুটি আসলে আমার নয়, অন্য-কারু; আর আমি আমার আঁটো-হ'য়ে-বসা

হাতের তলায় টের পেলুম, এই মসৃণ সুগন্ধি পেলব চামড়ার তলায়, বসানো আছে লম্বা হাড় আর অস্থি, কিন্তু কবজির জোড় বা কনুইয়ের তলাটা আমি কোনো অজ্ঞাত কারণে ছুঁয়ে দেখতে সাহস পেলুম না।

এই অনিচ্ছাকে জয় করার চেষ্টা করলুম আমি: কী আর থাকতে পারে কবজির আর কনুইয়ের তলায়, সত্যি-বলতে? আমার হাত দুটি লেসে ঢাকা, একটু আড়ষ্ট, একটু কর্কশ বসন, ফলে অস্বস্তি হ'লো, তাই আমার গ্রীবায় হাত দিয়ে দেখলুম। যাকে লোকে বলে মরালগ্রীবা—তার উপর মাথাটি বসানো রাজমহিমার মতো, কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই বসানো, সম্ভ্রম জাগায় এমন মর্যাদার ভাব তাতে; খোঁপার তলায় কান দুটি, ছোট্ট, সুগঠিত লতি দুটি দৃঢ়, কোনো দুল পরা নেই, কান বেঁধানো হয়নি আমার—কেন?—আমি হাত বুলিয়ে অনুভব করলুম কপাল, গাল, আমার ঠোঁট। আবারও আমার সরু দীঘল আঙুলের ডগায় তাদের স্পর্শ কেমন যেন আলাদা, অন্যরকম ঠেকলো। আশ্চর্য! কিন্তু আমার নিজের শরীর আমার কাছে অচেনা হবে কেমন ক'রে, যদি-না আমার অসুখ ক'রে থাকে, যদি-না আমি পাগল হ'য়ে গিয়ে থাকি?

যেন কোনো বাচ্চা মেয়ে, সরল আর নিষ্পাপ ব'লে যে যত-সব আজগুবি গল্পে বিশ্বাস ক'রে বসেছিলো, তার মতো চাপা গোপন ভঙ্গিতে আমি শেষ পর্যন্ত আমার কবজির দিকে হাত বাড়ালুম, কনুই ছুঁয়ে দেখলুম, ঠিক যে-জোড়টায় বাহু মিশেছে পুরোবাহুর সঙ্গে, আর কী যেন দুর্বোধ্য জড়ানো আছে সেই জোড়টায়। আমার আঙুলের ডগায় স্পর্শের কোনো বোধ রইলো না, যেন স্নায়ুগুলোকে চেপে আছে অন্য-কিছু, কিছু যেন ঢেকে আছে শিরাগুলো, আর আবার আমার ভাবনা সন্দেহ থেকে সন্দেহে লাফিয়ে উঠলো: কেমনভাবে এই তথ্যগুলো এসে পৌঁছুলো আমার কাছে, কেন আমি কোনো অঙ্গব্যবচ্ছেদকারীর মতো পরীক্ষা ক'রে দেখলুম আমার নিজের শরীর, এ তো কোনো তরুণী কুমারীর ধরন বা ভঙ্গি নয়, না আন্‌জেলিতা, না ডুয়েন্না, ডিউকদুহিতা—এ তো কারুই রীতি নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে কেমন-একটা আবেগ নেমে এলো আমার ওপর, যেন সব যন্ত্রণার উপশম অথচ তার সঙ্গে মেশানো একটা বাধ্যতা: এ তো খুবই স্বাভাবিক, এত অবাক হ'য়ো না তুমি, তুমি বাতিকেভরা, খেয়ালভরা, মাথা খারাপ তোমার,

যদি অসুখ ক'রে থাকে কিছুদিন আগে, দোহাই, আবার সেই অসুখের মধ্যে ফিরে যেয়ো না, স্বাস্থ্যকর ভাবনা ভাবো, ভাবো কার সঙ্গে কোথায় তোমার গোপন মিলন হবে…কিন্তু এই কনুই দুটি? এই দুটি মণিবন্ধ? চামড়ার নিচে—যেন কঠিন কিছু, তা কি তোমার ফুলে-ওঠা গ্রন্থি? চুনের পলেস্তারা পড়েছে? ক্যালশিয়ামের আস্তর? অসম্ভব—আমার রূপের সঙ্গে তা মোটেই মানায় না, বিশেষত এই অপরূপ সৌন্দর্যের সঙ্গে…অথচ সেখানে আছে কী যেন কঠিন, কী যেন শক্ত…ছোট্ট, শুধু জোরে চেপেই টের পেয়েছি আমি, ঠিক হাতের জোড়টার কাছে, যেখানে নাড়ি স্পন্দিত হ'য়ে উঠেছে, আর কনুইয়ের মোড়টাতেও…

তাহ'লে আমার শরীরেরও গোপন রহস্য আছে? তার ভিন্নতা তাহ'লে আমার সত্তার ভিন্নতার সঙ্গেই সুমানান; আমার এই আত্মপরীক্ষার ভয়ের মধ্যে কোথাও একটা রহস্যময় সম্পর্কসূত্র আছে আমার দেহ-মনের—আছে তাহ'লে কোনো বিন্যাসের রীতি, কোনো অসামঞ্জস্য, কোনো প্রতিসাম্য: যদি এখানে থাকে, তবে সেখানেও…যদি মনের মধ্যে কিছু, তবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও…যদি আমি, তাহ'লে তুমিও…আমি, তুমি, প্রহেলিকা…ক্লান্ত আমি, অবসন্ন; আমার রক্তে সে-কোন অসহনীয় গুরুভার, সে-কোন দুঃসহ উৎকণ্ঠা। আর তার কাছে আমার আত্মসমর্পণ করার কথা, ঘুমিয়ে পড়ার কথা, অন্যকোনো বিস্মরণের মধ্যে ডুবে-যাওয়ার কথা, মুক্তিদায়ী অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়ার কথা। আর তক্ষুনি ছোবল বসালো এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত যাতে কিছুতেই এই সনির্বন্ধ চাপের কাছে আত্মসমর্পণ না-করি, যাতে এই শোভন সুচারু বাক্সকে প্রতিরোধ করি (ভেতরটা কিন্তু সুচারু শোভন নয় মোটেই!), আর এই কুমারী মন, যে তুমি বড়ো বেশি কিছু জানো, বড়ো চটপট ধ'রে ফ্যালো সবকিছু, তুমি কিছুতেই ঘুমিয়ে পোড়ো না! গোপন সব কলঙ্কচিহ্ন ভরা শরীরের এই তীব্র সৌন্দর্যকে অমান্য করো তুমি! কে আমি? কে? আমার প্রতিপক্ষ এখন রেগে অস্থির, আর তার ফলে আমার আত্মা জ্ব'লে উঠলো অন্ধকারে দাউ-দাউ, যেন সত্যি ঝলমল ক'রে উঠলো সে মুহূর্তে। তমসো মা জ্যোতির্গময়…কোত্থেকে এলো এই বাণী? আমার আত্মা থেকে? অসতো মা সদ্‌গময়…

কিন্তু আমি যে একা, আর একাকিনী-আমি লাফিয়ে উঠলুম, ঐ নরম

কাফনে ঢাকা দেয়ালে আমার দাঁত বসাবার জন্য, আমি ছিঁড়ে ফেললুম জাজিম, শুকনো কর্কশ-কিছু দাঁতে ঠেকলো আমার। থু থু ক'রে ফেললুম আমি সুতোগুলো, আমার নখ যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে, ভালো, তাই ভালো, এটাই রাস্তা, এটাই উপায়, জানি না কার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ, আমার নিজের বিরুদ্ধে, না অন্য-কারু, কিন্তু না, না, না, না, কক্‌খনো না।

একটা আলো আমার চোখের সামনে, যেন কিছু-একটা মুকুলিত হ'য়ে উঠেছে, যেন কোনো সাপের ফণা, কিন্তু তা তো নয়, এ যে ধাতুর পাত? কোনো ছুঁচ? কিছু-একটা বিঁধে গেলো আমার গায়ে, হাঁটুর ওপর, উরুতে, বাইরে থেকে, ছোট্ট, প্রায়-অনুভব-করা-যায়-না এমন সূক্ষ্ম ব্যথা, একটা ছুঁচের ফোঁড়, আর তারপর আর-কিছুই না।

কিছুই না।

বীথিকার ওপরে আকাশ মেঘমেদুর। রাজোদ্যান আর তার গীতিমুখর ফোয়ারা, ঝোপগুলো সমানভাবে ছাঁটা—সযত্নলালিত, গাছগুলোর বিন্যাস জ্যামিতিক, লতাকুঞ্জ আর সিঁড়ির ধাপ, মর্মরে গড়া সব মূর্তি, প্রস্তরসজ্জা, প্রেমের দেবতার পঞ্চশর। আর আমরা দুজনে। শস্তা, সাধারণ, রোমান্টিক, আর মরিয়া হতাশায় ভরা। তার দিকে তাকিয়ে হাসলুম আমি স্মিত: আমার উরুর ওপর বিন্দুর মতো একটা ছোট্ট দাগ। কিছু দিয়ে ফুঁড়ে দেয়া হয়েছে আমায়। তাহ'লে আমার আত্মা, যেখানে আমি বিদ্রোহ করেছিলুম, আর আমার শরীরও, যেখানে তাকে আমি ঘৃণা করতে শিখেছি, তাদের দুয়েরই তাহ'লে কোনো বন্ধু আছে, কোনো মিত্রসুজন? এমন বন্ধু যে মোটেই ধূর্ত নয়। এখন আর তাকে আমি তত ভয় পাই না, এখন আমি শুধু ভূমিকা অনুযায়ী অভিনয় ক'রে যাচ্ছি। সত্যি-যে তার চাতুরী, তার ধূর্তামি এতটাই যে এই ভূমিকা সে চাপিয়ে দিয়েছে আমার ওপর, আর ভেতর থেকে জোর ক'রে ঢুকে পড়েছে আমার যেখানে আশ্রয়, আমার যেখানে দুর্গ। চতুর বটে, কিন্তু যথেষ্ট নয়—ফাঁদটা আমি দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। এখনও জানি না কী উদ্দেশ্য লুকোনো তার মধ্যে, কিন্তু ফাঁদটা দেখা যায়, ফাঁদটা স্পর্শসহ, সুবাস্তব; আর ফাঁদটা একবার যে

দেখে ফেলেছে সে তো আর তার মতো ততটা ভীত নয় যে তাকে দেখতেই পায়নি আদৌ।

এই কোলাহল চলেছে আমার ভেতর, এই অবিশ্রাম যুদ্ধ, আমার নিজের সঙ্গেই আমার এই তোলপাড় লড়াই, এই বাদ-প্রতিবাদ, এতই তীব্র যে এমনকী দিনের আলোও যেন তার এই সুগভীর অবস্থার পক্ষে নিদারুণ বিঘ্ন! এই আলোঝলমল রাজবীথিকা, যার মধ্যে রাজমহিমার প্রকাশ – তরুপল্লবের নয় – তার বদলে, এই দিনের বদলে, আমি অনেক বেশি পছন্দ করতুম আমার রাত্রি, কিন্তু এই তো দিন এসে হাজির এখানে আর এসে হাজির সে-ও, যে কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না, শুধু তার মধুর উন্মত্ততার জ্বলন্ত উপভোগের মধ্যে সুমগ্ন, আমার ছড়ানো এই ইন্দ্রজালের মধ্যে সম্মোহিত – আমারই এই মধুর মায়া, অন্যকোনো তৃতীয় ব্যক্তির নয়। ফাঁদ, বেড়াজাল, টোপ আর বঁড়শির বক্রতা, টোপ আর মারাত্মক হুল – আমি কি তাহ'লে শুধু এই? এই সবই আমি? ঝর্ঝর এই ফোয়ারাও কি সেই বেড়াজালেরই অংশ, আর এই রাজবীথিকা, আর ঐ দূরের আবছায়া? কিন্তু, সত্যি, কী বোকা সবকিছু! কার ধ্বংস ওঁৎ পেতে আছে, কার মৃত্যু? মিথ্যা সাক্ষীসাবুদে কুলোতো না কি? পরচুল মাথায় বৃদ্ধতে? একটা ফাঁস? কোনো বিষ? হয়তো খুবই বড়ো-কিছু জড়ানো এর সঙ্গে, বৃহত্তর-কিছু। কোনো দুঃশীল চক্রান্ত, কোনো সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র!

রাজার লতাকুঞ্জের গৌরবসাধনে বদ্ধপরিকর, হাঁটু-ঢাকা চামড়ার জুতো-পরা, মালিটি আমাদের দিকে এলোই না। আমি চুপ ক'রে রইলুম, কারণ স্তব্ধতাই ছিলো সব সুবিধের আকর; আমরা ব'সে রইলুম বিশাল সোপানশ্রেণীর এক ধাপে – এই সোপান যেন বানানো হয়েছে কোনো দানবের জন্য যে একদিন নেমে আসবে তার মেঘের প্রাসাদ থেকে শুধু এই সোপানশ্রেণীর ওপর দিয়ে হাঁটবে ব'লেই। পাথরের গায়ে খোদাই-করা কত প্রতীক: নগ্ন পঞ্চশর, অর্ধছাগ অর্ধঅপদেবতা, মূর্তির মুখ থেকে উপচে উঠেছে প্রস্রবণ, পিচ্ছিল মর্মরশিলার উপর ফোঁটা-ফোঁটা ঝরছে জল, বিধুর, মেদুর, ঐ আকাশের মতোই ধূসর। কোনো রাখালিয়া কাহিনীর দৃশ্য, প্রেমিকা আর তার প্রেমিক, নিকোলেৎ আর তার ওকাসেঁ, কী বমি পায় এ-সব ভাবলেই! এই বীথিকায় পৌঁছুবার সঙ্গে-সঙ্গেই – যখন

কোচবাক্স আমাকে এখানে রেখে চ'লে গেলো—আমার সংবিৎ ফিরে এসেছে পুরোপুরি ; আর আমি হেঁটে এসেছি লঘু চরণে, যেন এইমাত্র নেমে এলুম কোনো তপ্ত ধোঁয়া-ওঠা সুগন্ধি হামাম থেকে ; আমার বসন আজ অন্যরকম, বাসন্তী আর হালকা, একটা অস্পষ্ট কোনো বিন্যাস—যেন কোনো অচেনা ফুল, আর এই কুসুমাস্তীর্ণ উল্লেখ শুধু সম্ভ্রম বাড়াবারই কৌশল, যাতে একে ঘিরে রাখে কোনো অভেদ্য দুর্গের দেয়ালে। হাঁ, ঠিক ; কিন্তু আমি হেঁটে এলুম শিশিরভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে, আমার উরুতে ছোট্ট একটা দাগ, তাকে ছোঁবার ক্ষমতাও আমার ছিলো না, কিন্তু স্মৃতিই যথেষ্ট, তারা তো স্মৃতিকে মুছে ফ্যালেনি। আমি যেন এক বন্দী চেতনা, জন্মমুহূর্তেই শৃঙ্খলিতা, পরাধীনতায় আমার জন্ম : কিন্তু তবু তো চেতনা, তবু তো মন। আর তাই সে এসে-পড়ার আগেই, যখন দেখতে পেলুম আশপাশে নেই কোনো ছুঁচ বা শব্দধারকযন্ত্র, আমি শুরু ক'রে দিলুম আমার অভিনয়, কোনো অভিনেত্রী যেভাবে তৈরি হয় নাটকের যবনিকা ওঠবার জন্য, শুরু ক'রে দিলুম ফিশফিশ কথা, সেই সব মর্মরিত গুঞ্জন যা তার সামনে কখনও মুখ ফুটে বলতে পারবো কি না জানি না, অর্থাৎ অন্যভাবে বলা যায়, আমি ছুঁয়ে দেখতে চাচ্ছিলুম কোথায় আমার স্বাধীনতার সীমা—দিনের আলোর মধ্যে অন্ধের মতো হাৎড়ে বেড়াচ্ছিলুম তাকে, শুধু ছুঁয়ে-ছুঁয়ে তাকে জেনে নিতে চাচ্ছিলুম।

কী জানতে চাচ্ছিলুম ? কোন-কোন বিষয় ? শুধু সত্য যা, তা-ই—প্রথম, ব্যাকরণিক বিন্যাসের এই বদল, তারপর আমার অতীতের এই বিশৃঙ্খল বহুবচন, সেইসব অভিজ্ঞতা—সব—যাদের মধ্য দিয়ে আমি গেছি, যতক্ষণ-না ছুঁচের ফোঁড় থামিয়ে দিয়েছে আমার বিদ্রোহ। সে কি তার প্রতি আমার সহানুভূতি ছিলো ব'লে, তার প্রতি অনুকম্পায় ? তাকে ধ্বংস করতে চাইনি ব'লে ? না, কারণ তাকে আমি ভালোবাসি না, মোটেই না। এটা শুধু বিশ্বাসঘাতকতা : কোনো সদুদ্দেশ্য ছাড়াই আমরা অনধিকার প্রবেশ করেছি পরস্পরের জীবনে। তাহ'লে কি এইভাবে কথা বলা উচিত তার সঙ্গে ? আত্মবিসর্জন ক'রেই কি তবে তাকে আমি আমার কাছ থেকে, সর্বনাশ থেকে, বাঁচাতে চাই ?

না—তাও নয়, মোটেও সে-রকম নয়, ভালোবাসা আছে আমার, কিন্তু

অন্য-কোথাও—জানি না এ-কথা কেমন শোনালো। ওহ্, তীব্র এই প্রেম, সংরক্ত, অভিমানী, স্পর্শাতুর, অতিসাধারণ। তাকে আমি সব সঁপে দিতে চাই, আমার সর্বস্ব, দেহ আর মন, যদিও বাস্তবে নয়, শুধু প্রথামতো, রীতি-অনুযায়ী, প্রচলমাফিক, রাজসভার আদব-কায়দার যেমন দস্তুর সেইভাবেই, কারণ একে তো কেবল যেমন-তেমন হ'লেই চলবে না, একে হ'তে হবে বিস্ময়কর, চমকপ্রদ, সর্বাঙ্গসুঠাম, পুরোপুরি যেমন হয় কোনো রাজসভার প্রণয়সম্পর্ক।

তীব্র আমার প্রেম, বিশাল: আমি কেঁপে উঠলুম, চঞ্চল হ'য়ে উঠলো আমার ধমনী, সে যখন আমার দিকে তাকায় আমার সর্বাঙ্গ সুখে ভ'রে যায়। আর তীব্র আমার প্রেম, ছোট্ট; শুধু আমারই মধ্যে তা সীমাবদ্ধ, শৈলী তার সুঠাম, যেন কোনো সযত্ন-লালিত ছোট্ট কথা এই গুঞ্জনের মধুর বেদনাকে প্রকাশ ক'রে দিলে। আর তাই, এই অনুভূতির বাইরে, এই অনুভূতির পরপারে, তাকে বাঁচাবার কোনো বিশেষ ইচ্ছেই ছিলো না আমার, কারণ যখন আমার মন দিয়ে আমার এই প্রেমের বাইরে যেতে চাইলুম আমি, আমার কাছে সে তো আর কিছুই রইলো না, কিছুই না; অথচ আমার যে বন্ধু চাই একজন; কাল রাতে বিষাক্ত ধাতুর ফলা যে আমার উরুতে ফুটিয়ে দিয়েছিলো, তার সঙ্গে লড়বার জন্য একজন বন্ধু চাই যে আমার! আমার তো আর-কেউ নেই, আর সে তো পুরোপুরি বশ আমার, সম্পূর্ণ: আমি তো তার ওপর নির্ভর করতে পারি। এটা ঠিক যে আমার প্রতি তার যে অনুভূতি, তার বাইরে তার ওপর আমি কিছুতেই নির্ভর করতে পারবো না। সে আর কোনো দ্বৈরথের কথা জানে না—সে তার সীমার বাইরে যেতে পারবে না। সেইজন্যেই তার কাছে আমি খুলে বলতে পারবো না সম্পূর্ণ সত্য: যে, আমার এই প্রেম আর এই বিষাক্ত ছুঁচের ফোঁড়—দুয়েরই উৎস এক। আর শুধু এই জন্যেই এই দুয়ের প্রতিই আমার এই বিতৃষ্ণা: এত জঘন্য লাগে এই দুইকেই যে যেভাবে পায়ের তলায় এদের থেঁৎলে মারতে চাচ্ছিলুম আমি, যেমন ভাবে কোনো বিষাক্ত ও ভয়ানক টারান্টুলার ওপর পা দেয় কেউ। তাকে তো এ-কথা বলতে পারি না আমি, কারণ তার প্রেম হবে প্রচলনির্ভর, সে মেনে নেবে না যে-মুক্তি আমি মনেপ্রাণে চাই, যে-মুক্তি তাকেও ছুঁড়ে ফেলে দেবে পথের পাশে। আর তাই আমার

সম্বল শুধু ছলনা, তাই মুক্তিকেই দিতে হবে মিথ্যা নাম: প্রেম, আর শুধু এই প্রতারণার মধ্যেই আস্তে-আস্তে তার কাছে উন্মোচন করতে হবে সব, তাকে দেখিয়ে দিতে হবে কোন-সে অজ্ঞাত শত্রুর শিকার হ'তে চলেছে সে। রাজার শিকার? হ্যাঁ, কিন্তু যদি সে আক্রমণও করে রাজাকে, আমাকে তো তা মুক্তি দেবে না। রাজাই যদি সত্যি থাকেন এর পেছনে, এই বন্ধন থেকে এত দূরেই তাঁর অধিষ্ঠান যে তাঁর মৃত্যু আমার নিয়তিকে একতিলও বদলাবে না। কজেই, এইভাবে এগুতে পারবো কি না দেখবার জন্য, আমি এক ভিনাসমূর্তির সামনে থামলুম: তাঁর নগ্ন নিতম্বই পার্থিব প্রেমের পবিত্রতা-অপবিত্রতার প্রকাশ: আমি থামলুম যাতে এখানে, একেবারে নিরিবিলিতে আমি ধীরে-ধীরে তৈরি ক'রে নিতে পারি আমার রাক্ষুসে কৈফিয়ৎ, আমার দানবিক ব্যাখ্যা, সব শানানো যুক্তি সমেত, আমার ভৎর্সনা আর আমার তিরস্কার, যেন আমি কোনো ছুরিতে শান দিচ্ছি।

দারুণ কঠিন ছিলো। বারে-বারে আমি নিজেকে ধারালো করলুম এক অনতিক্রম্য সীমান্তের পাশে: জানি না কোনখানে আমার জিহ্বাকে দখল ক'রে বসবে সর্বনাশ, পাতাল; জানি না কোনখানে থুবড়ে পড়বে মন, কারণ এই মনও তো আমার শত্রু। পুরোপুরি মিথ্যার আশ্রয় নেয়া যাবে না, অথচ পৌঁছুনোও যাবে না সত্যের কেন্দ্রে, রহস্যের মর্মস্থলে। শুধু ধাপে-ধাপে আমি ছোটো ক'রে আনতে পারি পরিধি, অগ্রসরমান কুণ্ডলির ভেতর দিয়ে ক্রমে-ক্রমে এগিয়ে আসতে পারি শুধু। কিন্তু যেই তাকে দেখতে পেলুম দূরে, দেখতে পেলুম তার হাঁটার ভঙ্গি, দেখতে পেলুম আমাকে দেখবামাত্র কেমনভাবে সে ছুটে এলো, কালো হাতাহীন কুর্তার তলায় এখনও ছোট্ট এক ছায়া, অমনি আমি বুঝতে পারলুম সব চেষ্টাই ব্যর্থ হ'লো; প্রচল, শৈলী, রীতি—কেউ এতে সায় দেবে না, এটা কোন ধরনের প্রেমের দৃশ্য, যেখানে নিকোলেৎ তার ওকাসোঁর কাছে স্বীকার করে যে সে-ই তার নাগপাশ, তার জল্লাদ, তার ঘাতক? এমনকী রূপকথার গল্পেও যে এমন হয় না—রূপকথাও পারবে না এই বর্তমান থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে, সব ইন্দ্রজালের বাইরে দূরে কোথাও; যদি পারতো, তবে যেখান থেকে আমি এসেছি, সেই শূন্যতাতেও

ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারতো আমাকে। রূপকথার সব জ্ঞানই এখানে নিস্ফল অর্থহীন। সবচেয়ে রূপসী তরুণীও, যদি সে নিজেকে অন্ধ শক্তির অস্ত্র ব'লে মনে করে নিজেকে, যদি বলে ছুঁচের ফোঁড় আর লৌহনিগড়ের কথা, যদি এইসব কথা বিশদ ক'রেও বলে সে, তবে সন্দেহ নেই যে সে পাগল। আর পাগল ব'লেই সত্যের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই তার প্রলাপের, তা শুধু তার বিশৃঙ্খল উলটোপালটা তালগোল-পাকানো মনেরই সাক্ষী, আর সেইজন্যেই শুধু যে প্রেম আর আনুগত্যই চাই তার, তা নয়, চাই করুণাও।

এইসব অনুভূতির যোগসাজশের ফলেই সে হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করার ভান করবে, হয়তো আঁৎকে উঠবে, হয়তো আশ্বাস দিয়ে বলবে আমার মুক্তির জন্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, বাস্তবে আমাকে ডাক্তার দেখাবে, সবখানে ছড়িয়ে পড়বে আমার দুর্ভাগ্যের খবর—তার চেয়ে বরং তাকে অপমান করাও ভালো। তা ছাড়া, এই জটিল পরিস্থিতিতে, যত বন্ধুতা পাবো, তত প্রেম নয়—অথবা, অন্যভাবে, প্রেমিকের ভূমিকা থেকে নেমে দাঁড়াতে সে কিছুতেই রাজি হবে না, তার এই উন্মত্ততা এত স্বাভাবিক, এত সতেজ, এত স্ফতঃস্ফূর্ত, এত মৃন্ময়: ভালোবাসা, প্রেমে-পড়া, আহ্, প্রেমে-পড়া, আমার পায়ের তলার মাটি চিবিয়ে-চিবিয়ে নরম মোলায়েম ক'রে ফেলা - হ্যাঁ, সব করা যায়, কিন্তু আমার আত্মার উৎস কোথায় এ বিষয়টার ছায়াবাজির বিশ্লেষণ, তা নিয়ে নাড়াচাড়া—না, না, কখনও নয়!

আর তাই বোঝা গেলো যে যদি তার ধ্বংসের জন্য আমি আদিষ্টা হ'য়ে থাকি, মরতে তাকে, তবে, হবেই। কে হানবে তাকে মারাত্মক আঘাত, আমার কোন অঙ্গ? পুরোবাহু? আলিঙ্গনের মধ্যে আমার কব্জির মোচড়? কী আশ্চর্য সহজ সবকিছু— কী সহজ! কিন্তু এখন আমি জানি যে তার আর কোনো অন্যথা হবে না—এইই নিয়তি।

তার সঙ্গে যেতে হ'লো আমাকে, সেইসব পথ ঘুরে যার শোভা বাড়িয়েছে উদ্যানপালকদের বিদ্যা আর দক্ষতা; ক্ষিপ্রপায়ে আমরা স'রে গেলুম ভিনাস-মূর্তির কাছ থেকে, কারণ যে-রকম সোৎসাহে সে তার মোহিনী মায়া খুলে-খুলে দেখাচ্ছে আমাদের প্রথম প্রেমের স্বর্গীয় অনুভূতির সঙ্গে তা মোটেই মানায় না, যতই কেননা তাতে সুখের লাজুক রঙিন সব উল্লেখ থাকুক। আমরা পেরিয়ে গেলুম অর্ধছাগ অর্ধদেবতার কামুক মূর্তিগুলো; এরা স্থূল,

ভোঁতা, কিন্তু একটু অন্যভাবে, একটু হয়তো-বা উপযোগীও, কারণ পাথরের ঐ মূর্তিগুলোর পুরুষার্থ আমার শুচি ও কুমারী মনে তেমনভাবে ছাপ ফেলবে না—কারণ আমি যে যথেষ্ট শুচি তার প্রমাণই তো হ'লো এই যে তাদের কাছাকাছি এসেও আমি অসন্তুষ্টভাবে মুখ ফিরিয়ে নিইনি : তাদের মর্মরেখোদাই কামের উৎক্ষিপ্ত তাড়া বোঝবার অনুমতি ছিলো না আমার ।

আমার হাতে সে চুমু খেলে, সেই যেখানে শক্ত ছোট্ট-কিছু ছিলো, কিন্তু তার ঠোঁট তাকে বুঝতে পায়নি। আর কোথায় অপেক্ষা ক'রে আছে সেই চতুরের শিরোমণি ? কোচবাক্সের অন্ধকারে ? কিংবা আমার কাজ কি শুধু আরহোডেসের কাছ থেকে কোনো গোপন কথা বার ক'রে নেয়া : ধ্বংসের জন্য আদিষ্ট কোনো জ্ঞানী বুকের ওপর বসবার জন্য তৈরি কোনো স্টেথিস্কোপ কি আমি ?

তাকে আমি কিছুই বলিনি ।

দু-দিনের মধ্যে আমাদের প্রেম যথাবিধি এগুলো, যতটা এগুনো উচিত। আমি ছিলুম একদল অভিজ্ঞ গৃহসেবকের সঙ্গে, রাজমহাল থেকে আধমাইল দূরে এক প্রাসাদে ; ফ্লিবি, সে আমার সকল কাজের কাজি, এই পল্লিভবন ভাড়া করেছিলো, রাজবীথিকায় যেদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হয় তার পরদিন, আমাকে বলেওনি এই পল্লিভবন ভাড়া করতে গিয়ে কী-কী ব্যবস্থা তাকে করতে হয়েছে, আর আমি তো এমন-এক কুমারী টাকাকড়ির মতো তুচ্ছ বিষয় যার মাথায় আদপেই ঢোকে না—আমিও তাকে কিছু জিগেশ করিনি। বোধহয় আমি তাকে একটু বিরক্তও করি, আবার বোধহয় তার কোনো অস্ফুট ভয়েরও কারণ : হয়তো-বা তাকে গোপন কথাটি খুলে বলাই হয়নি, হয়নিই সম্ভবত, কারণ সে রাজারই হুকুম তামিল করে সবসময়, আমাকে সে সম্ভ্রম দেখায় শুধু কথায়। কিন্তু তার চোখে আমি লক্ষ করেছিলুম এক প্রগলভ বিদ্রূপের ছাপ - হয়তো ভেবেছিলো যে আমি হচ্ছি রাজার নবনির্বাচিতা ; আর আমি যে কোচবাক্সে ক'রে আরহোডেসের সঙ্গে দেখা করতে বেরুই তা তাকে ততটা অবাক করেনি, কারণ যে-ভৃত্য দাবি করে যে রাজা তাঁর রক্ষিতা বা উপপত্নীর

সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করুন যা সে বুঝতে পারে, যা যা তার মাথায় ঢোকে, সে মোটেই ভালো ভৃত্য নয়। যদি আমি কোনো কুমিরকেও আদর করতুম, তাহ'লেও বোধহয় একবারও তার চোখের পাতা পড়তো না! রাজার অনুজ্ঞার চৌহদ্দির মধ্যে আমি পুরোপুরি স্বাধীন—তাছাড়া রাজা তো একবারও আমার ধারে-কাছে আসেননি। এতদিনে আমি জেনে গিয়েছি যে এমন অনেক বিষয় আছে যা আমার প্রেমিককে আমি কখনোই বলবো না, কারণ তার কথা চিন্তা করবামাত্র আমার জিহ্বা আড়ষ্ট হ'য়ে যায়, আমার ঠোঁট অবশ হ'য়ে পড়ে - ঠিক সে রাতে যখন কোচবাক্সে আমার শরীর হাৎড়ে বেড়িয়ে আমার হাতের আঙুল অবশ হ'য়ে পড়েছিলো। আমার এখানে দেখা করতে আসতে আরহোডেসকে বারণ করেছিলুম আমি ; সে তার ব্যাখ্যা করেছিলো প্রচলন অনুযায়ী : অর্থাৎ সে যদি এখানে আসে তো তা নিয়ে জনরব ছড়াবে, কেলেঙ্কারির গল্প ছড়াবে, ছড়াবে কেচ্ছা ও গুজব. আর তাই সে, ভালোমানুষ, নিজেকে সংযত করেছিলো। তৃতীয় দিন সন্ধেবেলায় আমি, আমি, অবশেষে, আত্মনিয়োগ করলুম 'আমি, কে' তা জানতে। শোবার পোশাক পরেছিলুম আমি ; দেয়ালে-গাঁথা জানলার সামনে এবার সব পোশাক খুলে ফেললুম, দাঁড়িয়ে রইলুম সম্পূর্ণ নগ্ন, যেন কোনো পাথরের মূর্তি, আর রুপোর কাঁটা আর ইস্পাতের শলা প'রে রইলো ড্রেসিংটেবিলের ওপর, মখমলের শাল দিয়ে ঢাকা, কারণ—তাদের তীক্ষ্ণ ফলা নয়—আমি ভয় পাচ্ছিলুম তাদের ঝিলিককে। আঁটো স্তন দুটি উঁচু হ'য়ে আছে, আর গোলাপি বোঁটা দুটি পাশে ছড়ানো, তাকিয়ে আছে ওপরে ; উরুতে যে-ছুঁচ বেঁধানো হয়েছিলো তার সব চিহ্ন এখন মিলিয়ে গেছে ; কোনো শল্যবিদ্ যেমন ক'রে ব্যবচ্ছেদের জন্য তৈরি হয় তেমনিভাবে দুই হাত জোড় ক'রে আমি ফরশা ও পেলব মাংসে চাপ দিলুম, চাপের ফলে পাঁজরগুলো ঢুকে গেলো আরো ভেতরে, কিন্তু আমার পেট বেরিয়ে এলো উঁচু, গম্বুজের মতো, গথিক চিত্রকলায় যেমন দেখা যায়, আর এই উষ্ণ, কোমল, মসৃণ আস্তরের তলায় আমি অনুভব করলুম প্রতিরোধ, কঠিন, একরোখা, বশ-না-মানা ; আর আমার হাত দুটিকে উঁচু থেকে নিচে চেপে সরিয়ে-সরিয়ে ক্রমে ক্রমে অনুভব করলুম ডিমের ছাঁদের মতো কোনো শক্ত গড়ন আছে আমার ভেতরে। দু-পাশে

শামাদানে জ্বলছে ছ-টি ক'রে মোমবাতি: আমি তুলে নিলুম সবচেয়ে ছোট্ট ফলাটি, শল্যবিদের ফলা; ভয় পেয়েছি ব'লে সবচেয়ে ছোট্টটি নয়, বরং বোধহয় নান্দনিক বিলাসের জন্যই।

আয়নায় দৃশ্যটা দেখে মনে হ'লো আমি যেন নিজের গায়ে ছুরি বসাতে চাচ্ছি: নাটকীয়তার দিক থেকে চমৎকার নিখুঁত দৃশ্যটা, সর্বাঙ্গসুঠাম, একেবারে শেষ অনুপুঙ্খ অব্দি সুষ্ঠু, ঐ যে বিশাল পালঙ্ক আর তার ওপর চন্দ্রাতপ, দুই সারি লম্বা মোমবাতি, আমার হাতে একটা কঠিন ঝিলিক আর সারা গায়ে বিবর্ণ পাণ্ডুর মূর্ছনা, কারণ এটা ঠিক যে আমার শরীর মারাত্মক ভয় পেয়েছিলো, হাঁটুর জোড় যেন খুলে যাবে—থরথর ক'রে কাঁপছে, যে-হাতটা শল্যবিদের ছুরি ধ'রে আছে সে-ই শুধু আছে অকম্পিত। সেই ডিম্বাকার প্রতিরোধ যেখানে সবচেয়ে স্পষ্ট, আঙুলের চাপে যেখানে সে কিছুতেই বশ মানছে না, ঠিক উরঃফলকের তলায়, সজোরে বসিয়ে দিলুম আমি ছুরি, আমূল; একটু, ব্যথা, যৎসামান্য, তাও শুধু উপরিতলে, আর ক্ষত থেকে বেরিয়ে এলো, শুধু একফোঁটা, রক্ত। কশাইয়ের দক্ষতা দেখাবার মতো অবস্থা তখন আমার নয় যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থান যথাযথ বুঝে আস্তে কাটবো শরীরটাকে; আমি শরীরটাকে প্রায় দু-টুকরো ক'রে ফেললুম, একেবারে কুঁচকি অব্দি—যেটা উরু আর কটির সন্ধিস্থল, ছুরি চালালুম জোরে, সজোরে, দাঁতে দাঁত চেপে, চোখ বুঁজে। দেখবো? না, আমার সাহস নেই। অথচ তখন আর মোটেও কাঁপছি না আমি, শুধু জমাট তুষারের মতো হিম হ'য়ে আছি, ঘরটা শব্দে ভ'রে গেলো—যেন অনেক দূর থেকে অচেনা আওয়াজ ভেসে আসছে, কিন্তু শব্দটা আসলে আমার জোরে-জোরে শ্বাস ফেলার—যেন খাবি খাচ্ছি আমি। কয়েকটা আস্তর খুলে এলো শাদা চামড়ার মতো, আর আয়নায় আমি দেখতে পেলুম এক রুপোলি, গোপন বাসা, যেন এক বিশাল ভ্রূণ, এক ঝকঝকে শুঁয়োপোকা যেন লুকোনো আমার ভেতরে, দু-ভাগ হওয়া মাংসের ভাঁজের মধ্যে চকচক ক'রে উঠলো রক্ত ঝরছে না মোটেই, শুধু মাংসের রং গোলাপি। কী বীভৎস! নিজেকে এমনভাবে আবিষ্কার করা—কী তুলকালাম আতঙ্ক! কী বিভীষিকা! সেই রুপোলি আস্তরটা ছোঁবার সাহস হ'লো না আমার—রুপোলি, নিষ্কলঙ্ক, কুমারী, ছোট্ট

ঝকঝকে এক কফিনের মতো এই আমার আয়ত তলপেট, আর তার গায়ে নেচে উঠেছে মোমবাতির শিখাগুলোর প্রতিফলন; আমি নড়লুম, আর অমনি দেখতে পেলুম তার ভেতরে জুড়ে-জুড়ে বসানো সব টুকরো, সব অঙ্গ, সব শুঁড়, ভ্রূণের মতো, সাঁড়াশির ফলার মতো সরু, আর তারা সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়েছে আমার সারা শরীরে, আর আচমকা আমি বুঝতে পারলুম যে এই রুপোলি কফিন আর অন্য-কেউ নয়, মোটেই নয় কেউ বহিরাগত, এও আমি, আবারও আমি। তাহ'লে এই জন্যেই বীথিকার ভেজা বালির ওপর দিয়ে হাঁটবার সময় আমার পায়ের ছাপ পড়েছিলো এত গভীর, এই আমার সব শক্তির উৎস, আমার অন্ত্রের প্রবলতা, এই হলুম আমি, এখনও আমি, আবারও। আমি তখনও বারে-বারে এই কথা বলছিলুম নিজেকে, যখন সে এসে ঘরে ঢুকলো।

দরজায় তালা দিইনি আমি – খেয়ালই হয়নি। সে এসে ঢুকলো সন্তর্পণে, চুপিচুপি, এইভাবে, নিজের দুঃসাহসে নিজেই মুগ্ধ, হাতে বাড়িয়ে রইল – যেন এই তার সমর্থন আর আত্মরক্ষার বর্ম – লাল গোলাপের এক বিশাল ঢাল, যাতে তার এই অতর্কিত সাক্ষাৎকারের একটা কৈফিয়ৎ হয়; আর আমি, ঘুরে দাঁড়ালুম, আতঙ্কিত চীৎকার ক'রে—সে তাকিয়ে দেখলো আমাকে, কিন্তু লক্ষ করলো না, এখনও বুঝতে পারলো না, বোঝবার ক্ষমতা তার ছিলোই না। আর আমি, এবার ভয় থেকে নয়, বরং এক বীভৎস দমআটকানো লজ্জা থেকে দু-হাত দিয়ে মাংসের ভাঁজ টেনে আমার ভেতরকার সেই রুপোলি ডিমকে ঢেকে দেবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু বড্ড বড়ো সে, আর বড়ো বেশি অংশ আমি কেটে ফেলেছি ছুরি দিয়ে – পুরোপুরি ঢাকা গেলো না।

তার মুখ, তার নিঃশব্দ চীৎকার, তার পালিয়ে-যাওয়া! বিবরণের এ অংশকে ভুলে যেতে চাই আমি। সে অনুমতির অপেক্ষা করতে পারেনি, অপেক্ষা করতে পারেনি আমন্ত্রণের, অভ্যর্থনার, কাজেই এই ফুলের তোড়া নিয়ে সে এসেছে, আর বাড়ি ছিলো ফাঁকা—আমিই সব গৃহসেবককে কোনো বাধা যাতে না-পড়ে – তাই ছুটি দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, যাতে আমি যে-পরিকল্পনা করেছি তা ক'রে-ওঠা যায়, তাছাড়া, আর-কোনো পথ

খোলা ছিলো না আমার সামনে, ছিলো না অন্য-কোনো উপায়। কিন্তু হয়তো ঠিক তখনই প্রথম সন্দেহের বীজ বপন হয়েছিলো তার মধ্যে। আমার মনে প'ড়ে গেলো আগের দিন যখন আমরা এক ঝরনার শুকনো খাতের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলুম, সে কেমনভাবে মিনতি করেছিলো আমাকে ব'য়ে নিয়ে পেরুবে ব'লে আর আমি কেমনভাবে সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলুম, কোনো লাজুক ভাব থেকে নয়, কোনো সত্যি বা মিথ্যে শালীনতার বোধ থেকে নয়, বরং তা না-ক'রে আমার কোনো উপায় ছিলো না ব'লে। সে তখনই লক্ষ করেছিলো সেই নরম নমনীয় মাটিতে আমার পায়ের ছাপ, এত ছোট্ট অথচ এত গভীর, আর এ-সম্বন্ধে কিছু-একটা বলতে চাচ্ছিলো সে, কোনো-একটা নির্দোষ ঠাট্টা হয়তো, কিন্তু হঠাৎ শামলে নিয়েছিলো নিজেকে, আর তার কোঁচকানো ভুরুর মধ্যে ভাঁজ পড়েছিলো যা ততক্ষণে আমার খুব চেনা; উলটো ঢালটা বেয়ে উঠেছিলো সে আর আমি আসছিলুম পেছন-পেছন, তবু একবারও এমনকী আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়ায়নি। হয়তো তাহ'লে তখনি গজিয়েছিলো প্রথম সন্দেহ। আর পরে উৎরাইয়ের ঠিক ওপরটায়, আমি যখন টাল শামলাতে না-পেরে থুবড়ে পড়ছিলুম, টাল শামলাবার জন্য আমি আঁকড়ে ধরেছিলুম হেজেল ঝোপের এক ছোট্ট পুরুডাল, আমার মনে হয়েছিলো আমি যেন আস্ত ঝোপটাকে শেকড়শুদ্ধু উপড়ে ফেলছি, আর তাই আমি ব'সে পড়েছিলুম ধপ ক'রে, শুধু প্রতিবর্তী ক্রিয়ার বশেই, ভাঙা ডালটা ছেড়ে দিয়েছিলুম চট ক'রে, যাতে আমার এই প্রচণ্ড অবিশ্বাস্য শক্তি তার চোখে না-পড়ে। সে দাঁড়িয়েছিলো একপাশে, আমার দিকে তাকায়ওনি, অন্তত তা-ই আমি ভেবেছিলুম, কিন্তু সবকিছুই আড়চোখে দেখেও থাকতে পারে সে। তাহ'লে কি সন্দেহই তাকে এমনি চুপি-চুপি আসতে তাড়া দিয়েছে? না কি তাকে উশকেছিলো তার এই অদম্য প্রণয়?

কিছু এসে যায় না আর।

সাঁড়াশির সবচেয়ে পুরু অংশ দিয়ে আস্তে-আস্তে আমি হা-করা ভাঁজ-খোলা শরীরের মাংস চেপে ধরলুম, যাতে ঐ শুঁয়োপোকার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারি; হালকা হাতে নিজেকে তার হাত থেকে ছাড়িয়ে আনলুম, যার পরে আমি ডিউকণ্‌হিতা, ডুয়েন্না, আন্‌জেলিতা, মিনন হাঁটুর

জোর হারিয়ে ব'সে পড়'লো, তারপর উপুড় হ'য়ে স'রে গেলো এক পাশে, আর আমি বেরিয়ে এলুম তার মধ্য থেকে, আমার সব পা টান ক'রে, কাঁকড়ার মতো, আস্তে স'রে যেতে লাগলুম পেছনে। সে পালিয়েছিলো দরজা খোলা রেখে, বাইরে থেকে হাওয়া এসে ঢুকলো ঘরে, মোমবাতির শিখাগুলো কেঁপে-কেঁপে উঠলো, আয়নায় ঝলশে উঠলো প্রতিফলন ; আর ঐ ন্যাংটো জিনিশটা, অশ্লীলভাবে ছড়ানো তার দুই পা, প'ড়ে রইলো নিশ্চল ; আমার এই নকল খোলশ, গুঁটিপোকার এই চক্র—তাকে আমার ছুঁতে ইচ্ছে করলো না ; আর সে, যে এখন আমি, পাশ কাটিয়ে গেলো তাকে, যেন শুঁড়টা মাঝখানে বেঁকে গেছে এমনি-এক শুঁয়োপোকার মতো মুখ তুলে ; নিজের দিকে তাকালুম আমি আয়নায়। এই তাহ'লে আমি, আসল আমি, কোনো কথা ব্যবহার না-ক'রেই নিজেকে আমি বললুম। আমি। এখনও আমি। এই মসৃণ খোলশ, গ্রন্থিল সব জোড়, রুপোর ঠাণ্ডা জেল্লায় মোড়া তলপেট, ক্ষিপ্রতার জন্য আয়ত তার বিন্যাস, স্ফীত কালো মাথা, কীটবৎ—এই, তাহ'লে, আমি। বারে-বারে অবিশ্রাম আওড়ালুম তথ্যটাকে, যেন স্মৃতিতে গেঁথে রাখতে চাই তাকে, আর সেই সঙ্গে ডিউকদুহিতা, আন্‌জেলিতা, ট্লেনিক্সের বিবিধ আর বিচিত্র অতীত আস্তে-আস্তে ম্লান হ'য়ে ম'রে গেলো আমার মধ্যে, যেমনভাবে অনেক দিন আগে-পড়া কোনো বই হারিয়ে যায়, ছোটোদের সব বই—ছেলেবেলায় পড়া সব বই, যাদের বিষয়বস্তু আর মোটেই জরুরি নেই, আর যারা নাড়া দিতে পারে না, সত্যি-যে এখনও মনে করতে পারি তাদের, যে-কোনো দিকে আস্তে মাথা নেড়ে, আয়নায় আমার চোখ দেখবার চেষ্টা ক'রে, তবে এখন শুরু করছি সব বুঝতে, আস্তে-আস্তে, যদিও এখনও ঠিক অভ্যস্ত হ'তে পারিনি। এই আকারটা, যা এখন আমারই আকার, কিন্তু বুঝতে পারছি যে এই আত্মব্যবচ্ছেদ মোটেই আমার বিদ্রোহ ছিলো না পুরোপুরি, বরং ছিলো পরিকল্পনারই অংশ, পূর্বকল্পিত, স্থিরীকৃত, ঠিক এইরকম কোনো 'অপ্রস্তুত' ঘটনার জন্যই আসনে প্রস্তুত, অর্থাৎ যদি কখনও বিদ্রোহ করি তবে তা যাতে রূপান্তরিত হয় সম্পূর্ণ বশ্যতায়, চরম আনুগত্যে। আগেকার স্বাচ্ছন্দ্যেই সাবলীলভাবে ভেবে যেতে পারছি আমি, তবু সেই সঙ্গে আমি বশ্যতা মেনে নিয়েছি আমার এই নতুন শরীরের, তার ঝকঝকে ধাতুর মধ্যে যে-নড়াচড়ার রীতি আর অভ্যাস খোদাইকরা, আমি

অক্ষরে-অক্ষরে তাকে পালন করতে লাগলুম।

প্রেম ম'রে গেলো। তোমার মধ্যেও তা ম'রে যাবে, জেনো, হয়তো লাগবে কয়েক বছর কিংবা কয়েক মাস। প্রেমের এই মৃত্যু আমি অনুভব করলুম কয়েক মুহূর্তে। আমার সব সূচনার যে-পরম্পরা, যে-পর্যায়, তাতে এর স্থান তৃতীয়। আর একটা ক্ষীণ অস্ফুট হিশহিশ শব্দ ক'রে তিনবার ঘরটাকে ঘিরে ছুটলুম, বাড়িয়ে-ধরা কাঁপা-কাঁপা শুঁড়গুলো দিয়ে স্পর্শ করলুম বছানাটা – এখন, এই নতুন শরীরের জন্যই, তার ওপর শোবার কোনো ক্ষমতা বা অধিকার নেই আমার ; আমার অপ্রেমিক, আমার অপ্রণয়ীর গন্ধ টেনে নিলুম শুঁড় দিয়ে, যাতে তাকে অনুসরণ করতে পারি আমি, আমি তার এত চেনা অথচ এত অচেনা, আর এরই মধ্যে শুরু হ'লো নতুন—আর খুব সম্ভব—শেষ খেলা, শেষ পালা। তার ঐ খ্যাপা আতঙ্কিত পলায়নের চিহ্ন প্রথমে দেখা গেলো পর-পর খোলা দুয়ারগুলোয়, ছড়িয়ে-পড়া সব গোলাপের পাপড়িতে, গোলাপের গন্ধ হয়তো আমার সহায়ক হবে, যেহেতু তা-ই এখন তার গন্ধের সঙ্গে মিশে গিয়ে তারই গন্ধের অংশ হ'য়ে উঠেছে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য। যেহেতু নিচু থেকে দেখছি, মেঝে থেকে, তাই আমার দৃষ্টিকোণ এখন একেবারে নতুন হ'য়ে উঠেছে ; যে-ঘরগুলো দিয়ে ন'ড়ে-ন'ড়ে বুকে হেঁটে এগোলুম, তাদের, প্রথমত, মনে হ'লো বড্ড বড়ো, অনাবশ্যক বড়ো, যত রা[illegible] কম্ভূতকিমাকার অপ্রয়োজনীয় আশবাবে ভরা, আধো-অন্ধকারে ওঁৎ পেতে দাঁড়িয়ে আছে, তারা তারপর এলো পাথরের সিঁড়ির ধাপ, আমার নখের তলায়, তারপর নেমে এলুম এক বাগানে – অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে – এক নাইটিঙ্গেল গান করছে সে-কোন গাছের ডালে ব'সে। ভেতরে-ভেতরে কেমন হাসি পেলো আমার, একটু মজাই লাগলো : এখন সে একেবারেই অনাবশ্যক এক অনুপুঙ্খ, এই নতুন দৃশ্যের জন্য চাই পুরোপুরি নতুন সাজসজ্জা। লতাকুঞ্জের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ শুঁড় নেড়ে-নেড়ে পথ খুঁজে বেড়ালুম আমি। বুকের নিচে নুড়িপাথরের অনুভূতি। একবার দু-বার ঝোপটাকে ঘিরে ঘুরলুম, তারপর ছুটে গেলুম সামনে, শুঁড়গুলো আবার খুঁজে পেয়েছে গন্ধ। এই গন্ধ না-পেয়ে কোনো উপায় ছিলো না আমার, সব পলায়মান অস্ফুট গন্ধের মধ্যে তার গন্ধ কেমন স্নিগ্ধ সুষমায় ভরা, শুধু তারই গন্ধ এটা, অদ্বিতীয় তারই, আর কারু নয়, তার চলার পথে কেঁপে-কেঁপে দু-ভাগ হ'য়ে গেছে

হাওয়া, আর এখনও সব গন্ধের কণা রাতের হাওয়ায় ছড়িয়ে যায়নি, মিশে যায়নি, আর তাই আসল পথটাই বের ক'রে ফেললুম, শেষ যবনিকা না-নামা অব্দি এই পথটাই এখন আমার।

জানি না এটা কার ইচ্ছা বা পরিকল্পনা ছিলো যে তাকে স'রে যেতে দেবার জন্য বেশ খানিকটা সময় দেবো আমি, কারণ ভোর না-হওয়া পর্যন্ত, তার পেছন-পেছন না-গিয়ে, আমি রাজবীথিকায় এলোমেলো ঘুরে বেড়ালুম। একদিক থেকে তারও কোনো উদ্দেশ্য ছিলো নিশ্চয়ই, কারণ আমি শুধু সেই জায়গাগুলোতেই অনেকক্ষণ ইতস্তত ঘুরলুম যেখানে-যেখানে আমরা হেঁটে গিয়েছি বেড়াবার সময়, হাত ধরাধরি ক'রে, দুই ঝোপের মধ্যে সরু গলি দিয়ে, আর সেই জন্যই তার গন্ধ নিজের মধ্যে পুরোপুরি গেঁথে নিতে পারলুম আমি, শুধু তারই গন্ধ, নির্ভুলভাবে তারই, যাতে পরে আর-কারু গন্ধের সঙ্গে তা গুলিয়ে না-যায়। সত্যি-যে, আমি সোজা ছুটে যেতে পারতুম তার খোঁজে, তার মরীয়া নিরাশা আর অসহায় বিভ্রান্তির মধ্যে তাকে পেড়ে ফেলতে পারতুম, কিন্তু আমি তা করিনি। এখন মনে হয় আমার সে-রাতের সব কাজ আরো-একভাবে, একেবারে অন্যভাবেও, ব্যাখ্যা করা যায় : আমার অপরিসীম খেদ আর মনস্তাপে আর রাজার হর্ষ ও উল্লাসে, কারণ আমি হারিয়েছি আমার একমাত্র প্রেমিক, বদলে পেয়েছি শুধু এক শিকার, আর রাজার কাছে হয়তো তাঁর ঘৃণিত শত্রুর দ্রুত ও অতর্কিত মৃত্যু মোটেই তৃপ্তিকর হ'তো না। হয়তো আরহোডেস ছুটে ফেরেনি তার বাড়িতে, হয়তো বাড়ি না-ফিরে গেছে তার কোনো বন্ধুর কাছে, আর সেখানে, জ্বরাতুর তার সব উক্তি, নিজের সব প্রশ্নের উত্তর নিজেই জুগিয়ে (অন্য-কারু উপস্থিত তাকে যে শুধু আশ্বস্ত করবে তা নয়, মাথা ঠাণ্ডা রাখতেও সাহায্য করবে) শেষকালে গিয়ে পৌঁছেছে ব্যাপারটার মূলে, সত্যের একেবারে অন্তঃস্তলে। অন্তত, আর যা-ই হোক, রাজবীথিকায় আমার এই ঘোরাঘুরিকে মোটেই বিচ্ছেদের বেদনার ইঙ্গিত ব'লে মনে করা যাবে না। আমি জানি সব ভাববিলাসী উচ্ছ্বাসপ্রবণ লোকের কাছে তা কেমন অরুচিকর বা আপত্তিকর ঠেকবে, কিন্তু যেহেতু এখন আর হাত মুচড়ে-মুচড়ে মনোবেদনা প্রকাশ করার কোনো উপায়ই নেই আমার, ঝরাবার মতো কোনো চোখের জলও নেই যখন এখন, কোনো

হাঁটু নেই যে ভুমড়ে থুবড়ে পড়বে, আগের দিনের ফুলের পাপড়ি ঠোঁটে ছোঁয়াবার মতো কোনো ঠোঁটও নেই যখন আর, আমি আর মিথ্যে-মিথ্যি শোকে অস্থির বা আতুর হ'য়ে পড়ার চেষ্টা করিনি। আমাকে যা ব্যস্ত রেখেছিলো তা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের অসাধারণ ক্ষমতা, কারণ এই পথগুলো দিয়ে এলোমেলো ঘুরে বেড়াবার সময় আমার নিজের মধ্যে একবারও আমি সেই তার প্রতারক চেনা গন্ধ গেঁথে নিইনি যে ছিলো আমার বর্তমান নিয়তি, এতদিন যার অবিশ্রান্ত চেষ্টা ছিলো ভবিতব্যকে বুঝে নেয়া। আমি অনুভব করতে পারছিলুম আমার ঠাণ্ডা বাম ফুশফুশে বাতাসের সব অণুকণা, প্রতিটি অণুকণা, ছাঁকনির মতো সব সজাগ সচেতন কোষের মধ্যে তন্নতন্ন পরীক্ষার পর জমা হচ্ছে—আর যে-সব বাতাসের কণা সন্দেহজনক ব'লে বোধ হচ্ছে সব চ'লে যাচ্ছে আমার তপ্ত ডান ফুশফুশে, যেখানে আমার ভিতরচক্ষু, অন্তর্লীন চক্ষু, সন্ধানী ও জাগ্রত, সযত্নে সাবধানে তাকে পরীক্ষা ক'রে ক'রে দেখছে, যাচিয়ে দেখছে কী তার সঠিক অর্থ, আর তারপর ভুল গন্ধ ব'লে চিনে নিয়ে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে, ফেলে দিচ্ছে। আর কোনো অতিক্ষুদ্র পতঙ্গের পাখার শিহরনের চেয়েও দ্রুততর বেগে পুরো প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হচ্ছে, মানুষের বোধশক্তির চেয়েও ক্ষিপ্রতর বেগে। ভোরবেলায় রাজবীথিকা ছেড়ে চ'লে এলুম আমি। আরহোডেসের বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ফাঁকা, পরিত্যক্ত, হাঁ ক'রে খোলা ; সঙ্গে কোনো অস্ত্র নিয়ে গেছে কিনা সে, সে-প্রসঙ্গ নিয়ে আমি আদপেই নিজেকে বিব্রত করলুম না ; শুধু আবিষ্কার করলুম টাটকা গন্ধের পথচিহ্ন, আর তাকে অনুসরণ ক'রেই চললুম, এবার আর পথে দেরি করিনি। খুব-যে বেশিক্ষণ তাকে খুঁজতে হবে আমায়, তা আমার মনে হয়নি। অথচ দিন কেটে গেলো সপ্তাহে, সপ্তাহ মাসে, মাসের পর মাসে, আর আমি তবু তাকে খুঁজে চলেছি, খুঁজেই চলিছি, হ'ন্যে, অবিরাম, বিশ্রামহীন।

যার শ্রোণীর পাতে তার আপন নিয়তি খোদাই-করা, এমন অন্য যে-কোনো প্রাণীর চেয়ে এই অবস্থা আরো-জঘন্য ব'লে আমার মনে হ'লো। খুঁজে বেড়ালুম তাকে বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে, প্রচণ্ড রৌদ্রের দিনে, বনে-প্রান্তরে,

মাঠে-ঘাটে, আমার কাঁধের ওপর কখনো ঝ'রে পড়লো শুকনো নলখাগড়া, আমি গেলুম জলের মধ্যে ছপছপ ক'রে, যখন বন্যা এলো আমার গায়ে পিচকিরির মতো ছিটকে পড়লো জলের ফোঁটা, আমার ডিমের মতো শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়লো জল, গড়িয়ে পড়লো আমার মাথায়, সেই যেখানে তাকে দেখালো অশ্রুর কোনো অনুকরণ—না, তার কোনোই মানে নেই। আর আমার এই অবিশ্রান্ত তাড়ার মধ্যে চোখে পড়লো যে দূর থেকে আমাকে দেখবামাত্র কেমন ক'রে কেউ ছিটকে আঁকড়ে ধরে কোনো দেয়াল কিংবা কোনো গাছ কিংবা কোনো বেড়া, কিংবা এ-রকম কোনো আশ্রয় না-মিললে কী ভাবে হাঁটু মুড়ে ব'সে দু-হাতে মুখ ঢাকে, অথবা শুয়ে পড়ে উপুড়, মাটিতে মুখ গুঁজে, তাকে অনেক পেছনে ফেলে চ'লে না-যাওয়া পর্যন্ত ঐ ভাবেই শুয়ে থাকে সারাক্ষণ। আমার দরকার হয় না ঘুম, আর তাই রাতের বেলাতেও আমি ছুটে যাই নগর জনপদ বসতির মধ্য দিয়ে, পেরিয়ে যাই ছোটো গ্রাম, মাটির ভাঁড় আর সুতোয় ঝোলানো শুকনো ফলে সাজানো হাট-বাজার, আর ভিড় স'রে যায় ছিটকে, আমাকে দেখেই, বাচ্চারা পালিয়ে যায় কানাগলিতে, চ্যাঁচায়, আর্তনাদ করে সভয়, কিন্তু এ-সব কোনো-কিছুতেই দৃকপাতও করি না আমি, শুধু গন্ধ শুঁকে-শুঁকে ছুটে যাই। আমার সর্বাঙ্গ ভ'রে ফেলেছে তার গন্ধ, যেন কোনো পরম প্রতিশ্রুতি। এত দিনে আমি ভুলে গেছি তাকে দেখতে কেমন, আর আমার মন—শরীরের সহ্যশক্তি আর তার নেই ব'লে—বিশেষত নিশুত রাত্রে চলবার সময়—নিজের মধ্যে গুটিয়ে যায়, শেষটায় আমার খেয়ালই থাকে না কাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি, এমনকী এটাও খেয়াল থাকে না আসলে কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছি কি না আদপেই। শুধু এটাই জানি যে আমাকে ছুটতেই হবে সারাক্ষণ, এটাই আমার অমোঘ তাড়া, অপ্রতিরোধ্য তাগিদ; এই মৃগয়াই আমার ভবিতব্য, জগতের এই বিপুল বৈচিত্র্য যতদিন থাকবে, যতদিন থাকবে সাময়িক সরাই, ক্ষণকালীন আশ্রয়, অস্থায়ী বাসা, ততদিন এইভাবে সারাক্ষণ ছুটে যেতে হবে আমাকে, খুঁজে বার করতে হবে সে-কোনখানে লুকিয়ে আছে আহত সেই মৃগ; কারণ যদি কখনও এই তাগিদ দুর্বল হ'য়ে যায়, তখনই বোঝা যাবে যে ঠিক পথে আমি চলছি না—আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। কাউকেই কোনো-কিছু জিগেশ করিনি আমি, আর আমার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহসও

কারু হয়নি; আমি কীভাবে যেন বুঝতে পেরেছিলুম যে আমাকে দূর থেকে দেখেই যারা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ায় কিংবা মাটিতে মুখ গুঁজে লুটিয়ে পড়ে, তারা সবাই কেমন থমথমে ভয়ে ভ'রে আছে আর এই থমথমে ভয়ই আমার আতঙ্কজাগানো প্রশস্তি, কারণ আমি যে চলেছি রাজার মৃগয়ায়, আর তা-ই আমার অফুরন্ত শক্তির উৎস। কেবল ক্বচিৎ কোনো বাচ্চা, খুবই ছোটো, বড়োরা যাকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে সরাতে পারেনি, যাকে কোলে তুলে নিতে পারেনি আমার নিশ্চুপ অতর্কিত আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে, সে-ই দাঁড়িয়ে থাকে আমার পথে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে, হয়তো কাঁদতে শুরু ক'রে দেয়, কিন্তু আমি তাতে কোনো পাত্তাই দিই না, কারণ ছোটবার সময় আমাকে বজায় রাখতে হয় এক তীব্রপ্রখর একাগ্রতা, অটুট রাখতে হয় মন দুই পাশে, এই বালু আর ইটে-ভরা জগতের দিকে, এই শ্যামল স্নিগ্ধ চরাচরের দিকে, মাথার ওপরে ভেসে থাকে সমুদ্রের নীল, আর ভেতরের দিকে—আমার আভ্যন্তরীণ জগতে, যেখানে আমার দুই ফুশফুশের সুদক্ষ প্রক্রিয়া থেকে ভেসে আসে পরমাণুর গুঞ্জন, স্নিগ্ধ, সুন্দর, লাবণ্যময়, এত চমকপ্রদভাবে নির্ভুল তার স্বরলিপি। আমি পেরিয়ে যাই নদী-স্রোতস্বিনী, উপকূলের খাড়ি, আচম্বিত ঝরনার উচ্ছলতা, শুকিয়ে-যাওয়া ঝিলের আঠালো অববাহিকা, আর সবরকম প্রাণী আমাকে এড়িয়ে যায়, সব পশু, চমকে ছুটে পালায় নয়তো খোঁজে গর্তের অন্ধকার বা আশ্রয়, নিশ্চয়ই অর্থহীন হ'তো তাদের এই সব চেষ্টা যদি আমি ইচ্ছে করতুম তাদের পিষে ফেলতে, কারণ আমার মতো এমন বিদ্যুৎক্ষিপ্র কেউ নয়, কোনো প্রাণী নয়, কিন্তু চারপায়ে ছোটা ঐসব হুড়মুড় প্রাণীদের দিকে কোনো দৃক্পাতই করিনি আমি, কানে নিইনি তাদের ডুকরে-ওঠা ভয়ের চীৎকার, আমার সঙ্গে তাদের কোনোই সম্পর্ক নেই, আমার অন্য উদ্দেশ্য আছে, অন্য লক্ষ্য, একেবারেই অন্যরকম।

কয়েকবার আমি চ'ষে গিয়েছিলুম মস্ত সব পিঁপড়ের পাহাড়, ঠিক ক্ষেপণাস্ত্রের মতো; আর তাদের খুদে বাসিন্দারা, লালচে, কালো, ফুটকি-কাটা, অসহায়ভাবে পিছলে পড়েছিলো আমার ঝকমকে খোলার ওপর; আর একবার-দুবার অসাধারণ আকারের দু-একটা প্রাণী আমার পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছিলো, আর তাই যদিও তাদের সঙ্গে আমার কোনোই

বিবাদ বা বচসা নেই, শুধু তাদের আশপাশ দিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রে মূল্যবান সময় অহেতুক নষ্ট না-ক'রে, আমি টান-টান হ'য়ে উঠেছিলুম ধনুকের মতো, লাফিয়ে পড়েছিলুম তাদের ওপর, মুহূর্তে ভেদ ক'রে গিয়েছিলুম তাদের, আমার মাথায়-পিঠে সশব্দে ছড়িয়ে পড়েছিলো চুনের ভাঙা টুকরো আর লাল ফিনকির ঘর্ঘর শব্দ, কিন্তু ততক্ষণে আমি অনেক দূরে চ'লে গেছি, আর শুধু অনেক পরেই আমার খেয়াল হয়েছিলো কেমন ক্ষিপ্র আর হিংস্রভাবে আমি ছিটিয়ে দিয়েছি মৃত্যু। এও মনে পড়ে যে যুদ্ধক্ষেত্রের ওপর দিয়েও যেতে হয়েছিলো আমাকে, চারপাশে ছড়িয়েছিলো ধূসর আর সবুজ উর্দির স্তূপ, কেউ-কেউ তখনও নড়ছিলো, অন্যদের মধ্যে অবশেষে বিশ্রাম পেয়েছিলো অস্থিমজ্জা, কোনো হাড় প'চে গ'লে যাচ্ছে, কেউ-বা শুকিয়ে গেছে সম্পূর্ণ, ফোঁপরা, ফাঁপা, মজ্জাহীন, কেউ-বা একটু হলদেটে তুষারস্তূপের মতো শাদা। কিন্তু এদের দিকেও কোনো মনোযোগ ছিলো না আমার, কারণ মস্ত দায়িত্ব আছে আমার, এক বড়ো-কাজ, সুবিপুল কাজ, যে-কাজ শুধু আমার, শুধুই আমার জন্য পরিকল্পিত, সুনির্দিষ্ট। কারণ আমার যে অবসর নেই মোটেও, গন্ধ ফিরে আসবে আবার, ফাঁসের মতো পেঁচিয়ে যাবে, নিজেরই প্রাক্তন গন্ধের ওপর দিয়ে ছুটে যাবে, প্রায় হারিয়ে যাবে লবণ হ্রদের তীরে, রোদে পুড়ে শুকিয়ে যাবে ধুলোর মতো, আর আমার ফুশফুশে উশখুশ ক'রে উঠবে তারা, কিংবা হয়তো ধুয়েই যাবে বৃষ্টিতে; আর আস্তে-আস্তে আমি বুঝতে পারলুম এই যে প্রাণী আমার হাত এড়িয়ে যাচ্ছে বারে-বারে সেও চাতুরীতে ভরা, কুটিল, আমাকে হকচকিয়ে দেবার জন্য বিভ্রান্ত ক'রে দেবার জন্য যা-যা করা যায় সব সে করছে, চাচ্ছে পরমাণুর সুতো ছিঁড়ে ফেলতে যাতে তার অদ্বিতীয়ত্ব হারিয়ে যায় আমার সজাগ ভিতরচক্ষুর কাছে, যাতে একেবারে মিলিয়ে যায় হাওয়ায়। যদি সে সাধারণ মর্ত মানুষ হ'তো, এই যাকে আমি ধাওয়া ক'রে যাচ্ছি, তাহ'লে একটুক্ষণের মধ্যেই তাকে ধ'রে ফেলতে পারতুম আমি, তার নাগাল পেয়ে যেতুম; তার আতঙ্ক আর হতাশাই তাকে তার অনিবার্য শাস্তির হাতে তুলে দিতো, আমি নিশ্চয়ই নাগাল ধ'রে ফেলতুম তার, বিশেষত আমার যেহেতু আছে এই অবিশ্রান্ত ক্ষিপ্রতা আর চিরসন্ধানী ফুশফুশ—আর তাকে মেরে ফেলতুম আমি, ভাবতে যত

সময় লাগে তার চেয়েও দ্রুতবেগে। আমি সঙ্গে-সঙ্গে ছুটিনি তার পেছনে, জুড়িয়ে যেতে দিয়েছি গন্ধ, যাতে আরো ভালো ক'রে প্রমাণ করতে পারি আমার নাছোড় দক্ষতা, যাতে আমার শিকারকে সময় দিতে পারি যথেষ্ট—কারণ এটাই তো দস্তুর, এই শেষ দয়া-দাক্ষিণ্য, এমন দস্তুর যার মধ্যে ভয় গজিয়ে ওঠবার সুযোগ পায়; আর হয়তো একটু সময় দিতুম তাকে, একটু মানে যথেষ্ট, যাতে দূরে চ'লে যেতে পারে সে, অথচ যাতে বোধ করে আমি আছি তার পায়ে-পায়ে, নিশ্বাস ফেলছি তার ঘাড়ে, যাতে মরীয়া হতাশায় নিজের কোনো ক্ষতি ক'রে ফ্যালে শেষকালে আর এড়িয়ে যায় আমার চূড়ান্ত বিধান। আর সেই জন্যেই গোড়ায় খুব চট ক'রে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইনি আমি, বা অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু ক'রে ফেলতে চাইনি—তাহ'লে তো সে বুঝতে পারবে না কী তার বিধিলিপি, অভ্রান্ত আর আসন্ন। তাই কোনো-কোনো রাতে আমি থেমে গেছি, লুকিয়ে থেকেছি ঝোপেঝাড়ে, বিশ্রাম করার জন্য নয়, বিশ্রাম আমার লাগে না, একেবারেই তা অপ্রয়োজনীয় আমার কাছে, বরং ইচ্ছাকৃত উদ্দেশ্যমূলক এই বিলম্বন—তাছাড়া পরের চালটাও তো বিবেচনা ক'রে দেখা উচিত। আমার শিকারকে আর আমি আরহোডেস ব'লে ভাবি না, সে ছিলো এককালে আমার প্রেমিক, রূপমুগ্ধ, গুণমুগ্ধ, তবে সেই স্মৃতি এখন জুড়িয়ে গেছে, আর তাকে যে শান্তিতে মরতে দেয়া উচিত, তাও আমি জানতুম। আমার শুধু একটাই খেদ যে এখন আর আমার স্মিত হাসির কোনো ক্ষমতা নেই—যখন মনে প'ড়ে যায়, ঝাপশা, আবছায়া, সেই প্রাচীন কৌশলগুলো, সেই আন্‌জেলিতা, সেই ডুয়েন্না, সেই ডিউকদুহিতা, সেই রানীর সহচরী, সেই-সব মানুষী ফাঁদ, আর দু-একবার তাকিয়ে দেখেছি আমি নিজের দিকে জলের আয়নায়, ওপরে ভরা চাঁদ, পূর্ণিমার চাঁদ, শুধু এই কথাই নিজেকে বোঝাতে যে কোনো দিক থেকেই আমি তাদের মতো নই, যদিও এখনও আমি সুন্দর, এখনও আমি এক রূপের ডালি, কিন্তু আমার এখনকার সৌন্দর্য এক মারাত্মক হাতিয়ার, লক্ষ্যভেদী এক নির্মম অস্ত্র, সে ভয় জাগায়, তুমুল ভয়, আর এটাই তার প্রশংসা। খোলা আকাশের তলায় এইসব রাতে শুকনো মাটির ডেলা দিয়ে আমার তলপেট ঘষেছি আমি, আমাকে ক'রে তুলেছি ঝকঝকে,

চকচকে, আর আবার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ার আগে আমার হুলগুলো নেড়ে-নেড়ে দেখেছি, পরখ ক'রে দেখেছি তাদের ক্ষিপ্রতা, প্রস্তুতি, প্রতিবর্তী আন্দোলন, কারণ আমি যে জানি না কোন্ সেই দিন, কোন্ সেই লগ্ন, যখন এই হুল বিঁধিয়ে দিতে হবে অব্যর্থ।

মাঝে-মাঝে নিঃশব্দে সন্তর্পণে মানুষের বাসার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি আমি, শুনেছি গলার স্বর, আমাকে পেছন দিকে হেলিয়ে আমার ঝকঝকে শুঁড়গুলো দিয়ে আঁকড়ে ধরেছি জানলার গোবরাট, কিংবা বুকে হেঁটে উঠে গেছি ছাতে যাতে সেখান থেকে অনায়াসে ঝুলে থাকতে পারি, কারণ এটা তো ঠিক আমি নিছকই কোনো নিষ্প্রাণ যন্ত্র নই, যার মধ্যে শিকারী ফুশফুশ ভ'রে দেয়া হয়েছে, আমি এমন প্রাণী যার মন আছে, যে মন ব্যবহার করে। আর এই মৃগয়া এখন এতদিনের পুরোনো ব্যাপার যে সবাই তার কথা জেনে গেছে। আমি শুনেছি বুড়ি ঠাকুমা তার নাতি-নাৎনিকে ভয় দেখাচ্ছে আমার কথা ব'লে, আরহোডেস সম্বন্ধেও অগুন্তি গল্প শুনেছি আমি – সবাই তাকে পছন্দ করে। কিন্তু আমাকে সবাই ভয় পায়, যে-আমি রাজার দূত, তাঁর প্রতিনিধি। সাধারণ সরলসোজা মানুষ কী কথা বলাবলি করে তাদের বারান্দায় ব'সে-ব'সে? বলে যে আমি এক বিষম যন্ত্র যাকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে এমন-এক জ্ঞানী মানুষের বিরুদ্ধে যে সিংহাসনের বিরুদ্ধে হাত তুলতেও ভয় পায়নি।

অথচ কোনো সাধারণ মারণকল হবার কথা ছিলো না আমার, আমার বরং হবার কথা ছিলো বিশেষ-এক যান্ত্রিক কৌশল, যে যেমন-খুশি যখন-খুশি যে-কোনো মূর্তি ধারণ করতে পারে: যে হ'য়ে উঠতে পারে রাস্তার ভিখিরি, কোনো কাঙাল মানুষ, দোলনার শিশু, কোনো লাস্যময়ী রূপের ডালি, এবং সেই সঙ্গে যে আসলে এক ধাতুরচিত সরীসৃপ। শুঁয়োপোকার ক্ষরণের মধ্যেই লুকোনো আছে এইসব মূর্তি, আর তার শিকারের কাছে এই আততায়ী-দূত তা থেকে কোনো-একটা মূর্তি বেছে নিয়েই দেখা দেয়, শুধু তাকে ঠকাবার জন্য, শুধু তাকে ফাঁদে ফেলবার জন্য, কিন্তু অন্য-সকলের কাছেই সে দেখা দেয় রুপোর তৈরি এক কাঁকড়াবিছের মতো, এত ক্ষিপ্র তার গতি যে এখনও কেউ গুণে উঠতে পারেনি তার ক-টা পা আছে। এখানে এসেই গল্প নানা শাখায় পল্লবিত

হ'য়ে ওঠে। কেউ-কেউ বলে যে এই জ্ঞানী পুরুষ চেয়েছিলেন রাজার ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য ক'রে জন-সাধারণকে স্বাধীনতার স্বাদ এনে দিতে আর সেই জন্যেই রাজকীয় রোষে তিনি আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন; আবার অন্য কারু-কারু মতে—এই জ্ঞানী পুরুষের কাছে মৃত সঞ্জীবনী আছে যা ছিটিয়ে দিয়ে শহিদদের তিনি জাগিয়ে তুলবেন, রাজধানীতে যাদের ফাঁসি দিয়ে মারা হয়েছিলো। আর রাজশক্তির তা আদৌ মনঃপূত হয়নি, আর বাইরে তিনি রাজশক্তির প্রতি আনুগত্যের ভাব দেখিয়ে গোপনে-গোপনে তিনি গ'ড়ে তুলেছিলেন বিদ্রোহীদের এক বাহিনী—আবার এমনও অনেক লোক ছিলো আরহোডেসের কথা যারা আদপেই শোনেনি, তাকে তারা কোনো অলৌকিক শক্তিও দেয়নি, বরং তাকে তারা এমন মানুষ হিশেবে দেখেছিলো যার মাথায় ঝুলছে দণ্ডাজ্ঞার ছায়া, মৃত্যুদণ্ড, আর শুধু সেই জন্যেই যার প্রাপ্য ছিলো জনসমর্থন আর সাহায্য। যদিও কেউ জানে না সত্যি সে-কোন বিষয় জাগিয়ে তুলেছিলো রাজার রোষ, এটা বেরিয়ে পড়লো যে রাজা ডেকে পাঠিয়েছিলেন ওস্তাদ কারিগরদের, মহামিস্ত্রি যারা, যারা বৈজ্ঞানিক, তাদের হুকুম করেছিলেন তাদের কামারশালে বানিয়ে দিতে এক মৃগয়াযন্ত্র, এক মারণকল, আর সকলেরই মতে এই পরিকল্পনা, এই আদেশ ছিলো জঘন্যতম, অশুভ, অলুক্ষুণে: কারণ, শিকার যা-ই ক'রে থাকুক না কেন, রাজা তার জন্য যে-শাস্তি তুলে দিয়েছেন, তার মতো বীভৎস কিছু নিশ্চয়ই সে করেনি। এ-সব গল্পের কোনো শেষ ছিলো না, গল্পের পর গল্প, যার মধ্যে গ্রাম্য কল্পনা বেপরোয়া আর অপ্রতিরোধ্যভাবে বিকশিত হয়েছিলো, পল্লবিত হয়েছিলো—শুধু একটাই ছিলো তাদের সাধারণ লক্ষণ—সব গল্পই আমার ওপর আরোপ করেছিলো বীভৎস সব গুণপনা।

আরো শুনেছিলুম অগুন্তি মিথ্যে, সেইসব সাহসী আর বীরদের কথা যারা নাকি ছুটে এসেছিলো আরহোডেসকে সাহায্য করবার জন্য, যারা নাকি আমার পথ রোধ করার চেষ্টা করেছিলো, শুধু অসমান দ্বৈরথে পরিণামে থুবড়ে পড়ার জন্য—সব মিথ্যে কথা, কোনো জ্যান্ত প্রাণী আমার পথ রোধ করার সাহস করেনি। সেইসব রূপকথায় অবিশ্যি বিশ্বাসঘাতকদেরও ইয়ত্তা ছিলো না—কত-কত লোক নাকি আমাকে আরহোডেসের

পালাবার পথ দেখিয়ে দিয়েছে, বিশেষত যখন আমি সব সূত্র হারিয়ে বসেছি ; আর, বাহুল্য হবে বলা যে, তাও সর্বৈব মিথ্যা। কিন্তু এত-সব ঊনপঞ্চাশ কাহনের পরেও কেউ একটা কথা বলেনি আমি কে, বা আমি কী, আমার মনের মধ্যে কী আছে, আমি কি জানি কাকে বলে দ্বিধা, সন্দেহ, মরীয়া হতাশা—না, এ নিয়ে একটা কথাও বলেনি কেউ, আর তাও আমাকে অবাক করেনি।

আর একটা কথাও শুনিনি সেইসব যন্ত্র সম্বন্ধে, যে-সব যন্ত্র সাধারণ, সরল, দৈনন্দিন ; লোকের যা জানা, চেনা, পরিচিত ; সেইসব যন্ত্র যারা রাজার অনুজ্ঞা পালন করে, আর রাজার অনুজ্ঞাই তো আইন। মাঝে-মাঝে আমি এমনকী দীন এই কুটিরগুলোর বাসিন্দাদের কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখারও চেষ্টা করিনি, শুধু অপেক্ষা করেছি কখন সূর্য ওঠে তার জন্য, যাতে রোদের মধ্যে লাফিয়ে উঠতে পারি রুপোলি বিদ্যুতের মতো ; আর ঘাসের মধ্যে শিশিরের ঝলমলে পিচকিরি ছিটিয়ে আবার সংযোগ ঘটিয়ে দিতে পারি কালকে যেখানে স্থগিত করেছিলুম অভিযান আর আজ যেখানে শুরু করবো তা নতুন ক'রে। ক্ষিপ্রবেগে ছুটতে-ছুটতে আমি বেশ আনন্দ পেতুম যখন দেখতুম লোকে আমাকে দেখেই সাষ্টাঙ্গে প'ড়ে গেছে মাটিতে দণ্ডবৎ, আর তাদের চোখ হ'য়ে উঠেছে কাচের মতো চকচকে ; তাদের অবশ-করা অসাড়-করা আতঙ্ক আমাকে যেন এক জ্যোতির্বলয়ের মতো ঘিরে আছে—আর আমি তারিয়ে-তারিয়ে তার স্বাদ চাখতুম। কিন্তু শেষটায় এমন দিন এলো যেদিন আমার গন্ধের বোধ অলস হ'য়ে গেলো : খামকাই আমি চেষ্টা করলুম সেই পাহাড়ি এলাকায় বারে-বারে ঘুরে বেড়িয়ে যদি আবার সেই গন্ধ শুঁকে পাই, আর কেমন একটা দুর্ভাগ্যের বোধ ছেয়ে ফেললো আমাকে, আমার ত্রুটিহীন গড়নের নিষ্ফলতা কেমন যেন বাতিল আর অদরকারি ব'লে চিনিয়ে দিলে নিজেকে ; কিন্তু, তারপর, আমি যখন দাঁড়িয়ে আছি একটা ছোট্ট গোল টিলার ওপর, আমার হাতদুটি আড়াআড়ি ভাঁজ-করা, যেন ঘূর্ণিহাওয়ার আকাশের কাছে আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি, আমি হঠাৎ টের পেলুম আমার তলপেটের ঘণ্টায় একটা নরম, ক্ষীণ, অস্ফুট ঢংঢং শব্দ, আর বুঝতে পারলুম যে এখনও সব হারিয়ে যায়নি, এখনও আশা আছে, আর

যাতে এই ভাবনাটাকে কাজে খাটাতে পারি, আমি আবার হাত বাড়ালুম তারই উদ্দেশে যাকে আমি অনেকদিন আগেই পরিত্যাগ করেছিলুম—ভাষার উপহার, বাণীর অভ্যর্থনা। নতুন ক'রে তাকে শিখতে হবে না আমায়, আমি তো কবেই তাকে পেরেছিলুম, পরিশীলিত, সুমার্জিত, জটিল—কিন্তু তবু বাণীর বোধ আবার জাগিয়ে তুলতে হ'লো আমার নিজের মধ্যে, গোড়ায় শব্দগুলো উচ্চারণ করলুম কাটা-কাটা, খরশান, তীক্ষ্ণধার, কেমন যেন কাঠখোট্টা কর্কশভাব তাতে, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার গলার স্বর মানুষের মতো হ'য়ে এলো, আর আমি নেমে এলুম চড়াই বেয়ে ; এই বাণী ব্যবহার করতে হবে আমায়, গন্ধ যেহেতু আমাকে বিফল করেছে তাই এবার আমি ব্যবহার করবো ভাষা। আমার শিকারের উদ্দেশে কোনো ঘৃণা নেই আমার. কোনো রাগ নেই তার প্রতি, যদিও সে নিজেকে প্রমাণ করেছে এত চালাক আর কৌশলী ; সে তো আসলে তা-ই সুষ্ঠুভাবে ক'রে যাচ্ছে যে-ভূমিকার দায়িত্ব বর্তেছে তার ওপর—আমি যেমন পালন ক'রে যাচ্ছি আমার দায়িত্ব। আবার সেই চৌমোহনায় এসে দাঁড়ালুম আমি যেখানে হারিয়ে গিয়েছিলো গন্ধ ; শুধু দাঁড়িয়ে রইলুম একঠায়, কম্পমান, কিন্তু একচুলও নড়লুম না সেই চৌমাথা থেকে—যদিও একজোড়া পা আমাকে অন্ধের মতো চুনাপাথরের রাস্তায় যাবার জন্য টানছিলো, আর অন্য জোড়া সজোরে আঁকড়ে ধরেছিলো পাথরগুলো, টেনে নিতে চাচ্ছিলো অন্যদিকে—যেদিকে ছোট্ট একটা মঠের দেয়াল ঝলশে উঠেছিলো ধবল, আর তাকে ঘিরে ছিলো প্রাচীন সব গাছ। কোনোরকমে নিজেকে শামলে নিলুম আমি, তারপর বুকে হেঁটে এগোলুম আস্তে-আস্তে, যেন অনিচ্ছায় এগুচ্ছি, শরীরটা কেমন ভারি লাগছে ; এগিয়ে এলুম মঠের দুয়ারের দিকে, যার মুখেই দাঁড়িয়েছিলেন এক সন্ন্যাসী, শূন্যে মুখ-তোলা, বোধহয় তাকিয়ে আছেন দিগন্তের দিকে, যেখানে সূর্য উঠছে। ধীরে-ধীরে এগিয়ে এলুম আমি, যাতে আমার অতর্কিত আবির্ভাবে তিনি আঁৎকে না-ওঠেন, তারপর তাঁকে সম্ভাষণ জানালুম ; আর তিনি কোনো কথা না-ব'লে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন ; আমি জিগেশ করলুম তিনি কি আমাকে তাঁর কাছে স্বীকারোক্তি করার অনুমতি দেবেন—কারণ আমি এমন-একটা সমস্যায় পড়েছি নিজে থেকে যার কোনো সুরাহা করতে পারছি না।

প্রথমে আমি ভেবেছিলুম তিনি বুঝি আতঙ্কে হকচকিয়ে গেছেন, স্তম্ভিত ও বিমূঢ়, কারণ তিনি একটুও নড়লেন না বা কোনো উত্তরও দিলেন না, কিন্তু আসলে তিনি চিন্তা করছিলেন শুধু, শেষটায় তিনি আমাকে স্বীকারোক্তি করার অনুমতি দিলেন। আমরা তখন মঠের বীথিকায় ঢুকলুম; তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন, আমি তাঁকে অনুসরণ করলুম, আর নিশ্চয়ই আমাদের দেখে মনে হ'তো আশ্চর্য এক যুগল — যদি অবশ্য কেউ দেখতে পেতো আমাদের, কিন্তু সেই কাকভোরে আশপাশে কেউই ছিলো না, কেউই এই শুক্লবসন সন্ন্যাসী বা রুপোলি শুঁয়োপোকাকে দেখে অবাক হ'লো না। একটা আধো-হেলে-পড়া গাছের তলায় আমি তাঁকে সব খুলে বললুম; তিনি বসলেন — আনমনেই তিনি অভ্যাসবশে গির্জের পুরোহিতের ভঙ্গি নিয়ে নিয়েছেন স্বীকারোক্তির সময় যিনি সরাসরি মুখের দিকে তাকান না, শুধু মাথাটা হেলিয়ে রাখেন। আমি তাঁকে বললুম যে এই শিকারের পিছনে তাড়া ক'রে বেরুবার আগে আমি ছিলুম এক রূপসী যুবতী — রাজার আদেশে আরহোডেসের জন্যই আদিষ্টা, যার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো প্রাসাদের নাচের আসরে, যাকে আমি ভালোবেসেছিলুম তার সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরে কোনো কথা না-জেনেই, আর কিছু না-ভেবেই তারও মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলুম আমার প্রতি প্রণয়স্পৃহা, কারণ রাত্রে যখন আমার ঊরু ফুঁড়ে দেয়া হয়েছিলো ছুঁচ বিঁধিয়ে তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলুম আমরা শুধু পরস্পরের জন্যই আদিষ্ট, শুধু পরস্পরের জন্যই নির্মিত, অথচ আমি যে কী হ'তে পারি, আমি সত্যি তার কী, এটাও আমি বুঝতে পেরেছিলুম, আর তাই যখন দেখলুম আমাদের দুজনেরই জন্য মুক্তির আর-কোনো উপায় তোলা নেই আমি ছুরি বসিয়েছিলুম নিজের শরীরে, কিন্তু মৃত্যুর বদলে হ'লো এক পরিত্রাণহীন রূপান্তর। আগে যা ছিলো নিছক সন্দেহ, এখন থেকে তা-ই হ'য়ে উঠলো বাধ্যতা; সেই থেকে আমি আমার প্রেমিকের পিছনে তাড়া ক'রে বেড়াচ্ছি প্রতিহিংসার দেবীর মতো। কিন্তু মৃগয়ার তাতেই শেষ হয়নি, এই পশ্চাদ্ধাবন এতদিন ধ'রে চলেছে যে আরহোডেস সম্বন্ধে লোকে যা-যা বলাবলি করেছে সবই শেষে আমার কানে এসে পৌঁছেছে, আর যদিও আমি জানি না এই জনরবের মধ্যে কতখানি সত্য আছে, আমি আবার আমাদের এই বিস্তারহীন

অমোঘ নিয়তি সম্বন্ধে ভাবতে শুরু ক'রে দিয়েছি, আর আস্তে-আস্তে আবার তার জন্য আমার মনের মধ্যে ভালোবাসা জেগে উঠেছে—কারণ আমি যে তাকে মারতে চাই তা তো এই মরীয়া বোধ থেকেই যে আর আমি তাকে ভালোবাসতে পারবো না। এইভাবেই আমার নীচতা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে আমার সামনে, দেখতে পেয়েছি আমার ভালোবাসার রূপান্তর, তার ওলোটপালোট, তার ডিগবাজি, কীভাবে নষ্ট হ'য়ে গেছে প্রেম – আর আমি প্রতিহিংসায় আকুল হ'য়ে উঠেছি, অথচ তার একমাত্র দোষ এই যে নিয়তি তার ওপর বিরূপ। সেইজন্যেই আমি এই মৃগয়ায় ইতি দিতে চাই এখন, থামিয়ে দিতে চাই এই অবিশ্রাম পেছন-ধাওয়া, আমি চাই আমাকে দেখে কেউ যেন আঁৎকে না-ওঠে—হ্যাঁ, আমি এই অমঙ্গলের অবসান চাই, কিন্তু আমি যে জানি না উদ্ধারের পথ, কেমন ক'রে তা সম্ভব।

যদ্দূর অনুমান করতে পারি, এই বক্তব্যের শেষেও সন্ন্যাসী তাঁর অবিশ্বাস ত্যাগ করেননি : তিনি, গোড়াতেই, আমি কিছু বলতে শুরু করার আগেই, আমাকে সরাসরি সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন যে আমি যা-ই বলি না কেন তাকে কিছুতেই স্বীকারোক্তি বলা যাবে না, কারণ তাঁর মতে আমি এমন জীব স্বাধীন ইচ্ছা ব'লে যার কিছু নেই। আর, এ-কথাও তিনি জিগেশ করতে পারতেন যে আমাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছে কি না—সত্যি-তো এমনতর গুপ্তচর অনেক আছে, ছদ্মবেশী, প্রতারক, অবিশ্বাসী – কিন্তু তাঁর উত্তর শুনে মনে হ'লো তার উৎস সততা। তিনি বললেন : আর যাকে তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছো, তাকে খুঁজে পেলে কী হবে? তুমি কি জানো তখন তুমি কী করবে?

আমি উত্তর দিলুম : তাত, আমি কী করতে চাই না তা-ই শুধু আমি জানি, কিন্তু আমার মধ্যে কী-এখন সুপ্ত আছে, কী তখন ঘুম ভেঙে জেগে উঠবে, কী ভাবে তার প্রকাশ ঘটবে, তা আমি কিছুই জানি না, আর, তাই, আমি যে খুন করবো না, সে-কথা আমি কিছুতেই বলতে পারি না।

তিনি আমাকে বললেন : তাহ'লে তোমাকে আমি কী পরামর্শ দিতে পারি, বলো? তুমি কি চাও এই দায়, এই বাধ্যতা থেকে তোমাকে মুক্তি দেয়া হোক?

যেন কুকুর বসেছিলুম তাঁর পায়ের কাছে, এমনিভাবে আমি মুখ তুলে

তাকালুম : আমার রুপোর খুলি থেকে রোদ ঝিলকে উঠলো, দেখলুম তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। আমি বললুম : তার বেশি আর-কিছুই আমি চাই না, যদিও আমি জানি আমার জীবন তখন হ'য়ে উঠবে দুর্বহ, নির্মম, অকরুণ, কারণ তখন আর-কোনো উদ্দেশ্য, আর-কোনো লক্ষ্যই থাকবে না ; আমাকে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে আমি তার কোনো পরিকল্পনা করিনি, আমার তাতে কোনোই হাত ছিলো না। জানি যে তার জন্য আমাকে দাম দিতে হবে, হয়তো চূড়ান্ত দাম, কারণ রাজার অনুজ্ঞার অবাধ্যতা করলে, শাস্তি আছেই, আর আমিই তখন রাজার ঘাতকদের চাঁদমারি হ'য়ে উঠবো, হ'য়ে উঠবো রাজার জল্লাদদের কুঠারের লক্ষ্য – হয়তো প্রাসাদের গুপ্ত ঘর থেকে আমার পেছনে লেলিয়ে দেয়া হবে একঝাঁক ধাতুনির্মিত শিকারি কুকুর – আমাকে ধ্বংস করার জন্য পালে-পালে তারা বেরিয়ে পড়বে জগতে। আর আমি যদি তাদের হাত থেকে রেহাইও পাই, আমার মধ্যে যে দক্ষতা পুরে দেয়া হয়েছে তার সাহায্যে তাদের এড়িয়ে যদি আমি জগতের একেবারে শেষ সীমাতেও চ'লে যাই, যেখানেই আমি আত্মগোপন ক'রে থাকার চেষ্টা করি না কেন, সবাই, সবকিছুই আমাকে এড়িয়ে চলবে, এমন-কিছুই আমার থাকবে না যাতে মনে হয় আমার এই বেঁচে-থাকার কোনো অর্থ আছে, কোনো সার্থকতা আছে। আর, আপনার যে-জীবন তাও আমার কাছে রুদ্ধ, কারণ প্রত্যেকেই আমাকে বলবেন – যেমন আপনি আমাকে বলেছেন – যে আমি মোটেই স্বাধীন নই, আমার নেই আত্মিক স্বাধীনতা, অতএব কোনো মঠের আশ্রয় নেবারও অধিকার নেই আমার।

চিন্তায় তলিয়ে গেলেন তিনি, তারপর হঠাৎ অবাকভাবে ব'লে উঠলেন : তোমার মতো জীবদের কী ক'রে বানায়, তা আমি আদৌ জানি না, অথচ তবু আমি তোমাকে চোখে দেখছি, তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি আর তুমিও আমাকে দেখতে পাচ্ছো, শুনতে পাচ্ছো—আর তোমাকে দেখে-শুনে মনে হচ্ছে তুমি বুদ্ধিমান, যদিও হয়তো তোমার বাধ্যতা তোমার ভেতরকার চাপ তোমার অন্তর্লীন তাগিদ নেহাৎই সীমাবদ্ধ : অথচ তবু, হে যন্ত্র, যেমন তুমি আমাকে বললে, তুমি এই বাধ্যতার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছো, আর আরো যেমন বললে যে যদি তোমার কাছ থেকে এই জিঘাংসার তাড়া এই প্রতিহিংসার তাগিদ কেড়ে নেয়া হয় তুমি মুক্তির স্বাদ পাবে, তোমার মনে হবে

পরিত্রাণ পেলে, তখন তুমিই আমাকে বলো, ঠিক কেমন লাগে এই জিঘাংসার তাড়া? ঠিক কেমনভাবে তা তোমার মধ্যে কাজ ক'রে যায়?

আমি উত্তর দিলুম : তাত, হয়তো তা সম্পূর্ণ ঠিক নেই আমার ভেতরে, কিন্তু যদি শিকারের কথা ওঠে, যদি কথা ওঠে কেমন ক'রে অনুসরণ করে, পথ খুঁজে বার করে, গন্ধ শুঁকে পায়, তাড়া লাগায়, কেমন ক'রে ব'সে থাকতে হয় ওঁৎ পেতে, চুপি-চুপি যেতে হয় পেছনে, ঘাপটি মেরে থাকতে হয় অগোচরে, যদি কথা ওঠে কেমন ক'রে ওঠে চুরমার ক'রে দিতে হয় পথের বাধা, সব চিহ্ন লোপ ক'রে দিতে হয়, কেমন ক'রে রচনা করতে হয় ব্যূহ, যুদ্ধের কৌশল, হত্যার উপায়, তাহ'লে আমি বলবো যে এ-সম্বন্ধে আমি সব জানি, অব্যর্থ দক্ষতার সঙ্গে এ-সব কাজ করতে পারি আমি, মুহূর্তে আমি নিজেকে রচনা ক'রে দিতে পারি আমোঘ সর্বনাশের বাক্যে, আর তা থেকে তৃপ্তি পাই আমি, তাতে আমার সুখ হয়, কারণ সন্দেহ নেই আমার অন্ত্রের আগুনে এই নির্দেশগুলোই ঝালাই ক'রে দেয়া হয়েছে।

'আরেকবার তোমাকে জিগেশ করছি,' তিনি বললেন, 'বলো, সত্যি, আরহোডেসকে দেখতে পেলে তুমি কী করবে?'

'তাত, আমিও আবার বলতে চাই যে আমি সত্যি জানি না-তার কোনো হানি হোক তা আমি চাইনে, কিন্তু আমার ভেতরে যে-নিদান বসিয়ে দেয়া আছে, যে-কথাগুলো ঝালাই ক'রে দেয়া হয়েছে, তার জোর হয়তো আমার নিজের ইচ্ছাশক্তির চেয়েও অনেক বেশি।'

এ-কথা শুনে তিনি তাঁর হাত দিয়ে চোখ দিয়ে ঢাকলেন, বললেন : 'তুমি আমার ভগিনী – আমার বোন।'

আমি আশ্চর্য হ'য়ে জিগেশ করলুম, 'এ-কথার কী অর্থ করবো আমি?'

'ঠিক যা আমি বললুম,' তিনি বললেন, 'আর তার মানে আমি নিজেকে তোমার চেয়ে উঁচুও বলি না অথবা নিচুও বলি না, কারণ আমরা যতই ভিন্ন হই না কেন, তোমার অজ্ঞতা, তোমার অবোধ দ্বন্দ্ব, যার কথা তুমি আমার কাছে স্বীকার করেছো, আর যে-কথা আমি বিশ্বাস করেছি, আমাদের দুজনকেই ঈশ্বরের চোখে সমান ক'রে দিয়েছে, আর তাই এবার আমার সঙ্গে এসো—আমি তোমাকে একটা জিনিশ দেখাতে চাই।'

মঠের বীথিপথ ধ'রে এগিয়ে গেলুম আমরা, তাঁর পেছনে আমি, আর

শেষে একটা কাঠের চালার কাছে এসে পৌঁছলুম। দরজায় ধাক্কা দিলেন সন্ন্যাসী, আর দরজা ক্যাঁচকেঁচ শব্দ ক'রে খুলে গেলো। আর সেই আবছায়ায় অস্পষ্ট দেখতে পেলুম কালো কী একটা প'ড়ে আছে বিছানো খড়ের ওপর, আর আমার নাসারন্ধ্র দিয়ে তক্ষুনি ফুশফুশে গিয়ে ঢুকলো গন্ধের ঝলক, আরে, এই গন্ধকেই তো আমি অবিশ্রান্ত তাড়া ক'রে বেরিয়েছি, আর সে-গন্ধ এখানে এখন এত জোরালো যে আপনা থেকেই আমার অজান্তেই আমার হুল সাড়া দিয়ে উঠলো, বেরিয়ে এলো উদরের গর্ত থেকে, আর পরের মুহূর্তেই আমার দৃষ্টি অন্ধকারে অভ্যস্ত হ'য়ে এলো আর আমি আমার ভুল বুঝতে পেলুম। খড়ের ওপর শুধু তার পরিত্যক্ত পোশাক প'ড়ে আছে। আমার শিহরন দেখে সন্ন্যাসী বুঝতে পারলেন যে আমি দারুণ উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছি, আর তিনি বললেন: হ্যাঁ, আরহোডেস এখানে ছিলো। এক মাস আগে এই মঠে সে লুকিয়ে ছিলো, তোমার অবিশ্রাম তাড়া থেকে সে কোনোমতে পালাতে পেরেছিলো তখন। আগের মতো কাজ করার সুযোগ বা অবকাশ পাচ্ছে না ব'লে খুব দুঃখ ছিলো তার; তাই গোপনে তার অনুবর্তীদের সে জানিয়ে দেয়—তারা মাঝে-মাঝে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে আসতো—কিন্তু দুই বিশ্বাসঘাতক গোপনে অনুবর্তীদের সঙ্গে এখানে ঢুকে পড়ে—পাঁচ দিন আগে তারা তাকে ধ'রে নিয়ে চ'লে গেছে।

'বিশ্বাসঘাতক মানে কি "রাজার গুপ্তচর"?' আমি তখনও কাঁপছি আর আমার দুই হাত বুকের ওপর প্রার্থনার ভঙ্গিতে ভাঁজ করা।

'না, আমি বলেছি "বিশ্বাসঘাতক", কারণ তাকে তারা প্রতারণা ক'রে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যায়; যে ছোট্ট কালা-বোবা ছেলেটিকে আমরা আশ্রয় দিয়েছিলুম সে-ই শুধু কাকভোরে তাদের চ'লে যেতে দেখেছিলো। পিঠমোড়া ক'রে বাঁধা ছিলো আরহোডেস আর তার গলায় উঁচনো ছিলো ছোরা।'

'জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যায়?' কিছুই বুঝতে না-পেরে আমি জিগেশ করলুম: 'কারা? কোথায় নিয়ে গেলো তাকে? কেন?'

'আমার ধারণা যাতে তারা তার মানসিক শক্তিকে নিজেদের কাজে লাগাতে পারে। আমরা আইনের সাহায্য নিতে পারি না, কারণ আইন এখানে

রাজার। তাই তারা তাকে কাজে লাগাবার জন্য জোর খাটাবে, আর যদি সে কিছুতেই রাজি না-হয় তবে তাকে তারা খুন করবে, কিন্তু তার জন্য কোনো শাস্তিই পাবে না।'

'তাত,' আমি বললুম, 'শুভ সেই লগ্ন যখন আমি সাহস ক'রে আপনার কাছে এসে কথা বলেছি। যারা তাকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে এবার আমি তাদের সন্ধানে বেরুবো আর আরহোডেসকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসবো। আমি জানি কেমন ক'রে শিকার করে, কেমন ক'রে খুঁজে পেতে হয় হদিশ, তার চেয়ে ভালো আর-কিছুই আমি করতে পারি না. শুধু আমাকে দেখিয়ে দিন তারা কোন্ পথে গেছে, কারণ সেই বোবা-কালা ছেলেটির কাছ থেকে শুধু আপনিই সঠিক রাস্তাটি জেনে নিয়েছেন।'

তিনি উত্তর দিলেন: অথচ এখনও তুমি জানো না তাকে দেখে তুমি নিজেকে সংযত ক'রে রাখতে পারবে কিনা…তুমি নিজেই সে-কথা আমার কাছে স্বীকার করেছো!

এ-কথার উত্তরে আমি বললুম: তা ঠিক, তবু আমার মনে হয় আমি কোনো পথ খুঁজে পাবো। এখনও আমার মনে স্পষ্ট কোনো ধারণা দানা বেঁধে ওঠেনি – হয়তো আমি খুঁজে বার করবো কোনো ওস্তাদ কারিগরকে, এমনকোনো মিস্ত্রিকে যিনি আমার মধ্যে বিদ্যুৎলহরীর গতিপথ বদলে দিতে পারবেন, যাতে আমার নিজের ইচ্ছা আর আমার নিয়তির মধ্যে কোনো বিরোধ না-থাকে।

সন্ন্যাসী বললেন: বেরিয়ে পড়বার আগে, ইচ্ছে করলে, তুমি আমাদের আরেকজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নিতে পারো। কারণ আমাদের এই সম্প্রদায়ে যোগ দেবার আগে, বাইরের পৃথিবীতে, ঠিক এইরকম যন্ত্ররচনবিদ্যাতেই তিনি বিশারদ ছিলেন। এখন তিনি সম্প্রদায়ের মধ্যে চিকিৎসক হিশেবে কাজ করেন।

আবারও আমরা গিয়ে দাঁড়ালুম সেই রৌদ্রজ্বলা মঠবীথিকায়। আর যদিও কোনো ইঙ্গিতই দেখাননি তবু আমি বুঝতে পারছিলুম তিনি এখনও আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারছেন না। পাঁচ দিনের মধ্যে গন্ধ অনেকখানি উবে গিয়েছে, আর তাই তিনি অনায়াসেই আমাকে যে-কোনো রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারেন—ভুল, না সঠিক—কিছুই আমি বুঝতে

পারবো না। আমি রাজি হলুম।

চিকিৎসক আমাকে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, খুব সাবধানে, সজাগভাবে আমার তলপেটের জোড় খুলে আমার শরীরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন এক কালো লণ্ঠন, তন্নতন্ন ক'রে দেখলেন সবকিছু, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আলখাল্লা থেকে ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে বললেন :

'এ-রকম প্রায়ই হয় যে এ-ধরনের নির্দেশ-দিয়ে-পাঠানো যন্ত্রকে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুরা বা কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাত কেউ তাদের উদ্দেশ্য বানচাল ক'রে দেবার জন্য রাস্তায় আটকে ফ্যালে। তা যাতে না-করা যায় এই জন্য রাজার যন্ত্রবিদেরা আলো-হাওয়া নিরোধ-করা যায়, এমন কোনো খোপে সব নির্দেশ তালাবন্ধ ক'রে রাখে আর তাকে মূল তড়িৎকোষের সঙ্গে এমনভাবে সংযুক্ত ক'রে দেয় যে তা নিয়ে একটু অদল-বদল করতে গেলেই মৃত্যু অনিবার্য। শেষ মোহর বসাবার পরে এমনকী তারাও আর হুলটাকে সরাতে পারে না। তোমার বেলাতেও ঠিক তা-ই করা হয়েছে। এ-রকমও হয় যে শিকার নিজেকে বিভিন্ন বেশভূষায় লুকিয়ে ফেলে দিলো বা এমনভাবে ছদ্মবেশ প'রে নিলো যে শুধু-যে তার চেহারাই পালটে গেলো, তা নয়, পালটে গেলো তার আচার-ব্যবহার, হাবভাব, গায়ের গন্ধ, কিন্তু তার মন—তাকে সে বদলাতে পারে না—আর সেই জন্যেই যন্ত্র শিকার করার বেলায় শুধু তার গায়ের গন্ধের ওপর নির্ভর ক'রেই সন্তুষ্ট থাকে না, বরং সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে শিকারকে কেবল অবিশ্রাম জেরা করে, আর এই প্রশ্নের তালিকা তৈরি ক'রে দেন মনস্তত্ত্ববিদেরা—যাঁরা মানুষের মনের সব গলিঘুঁজির খবর রাখেন, যাঁরা জানেন ব্যক্তি-মানুষের সব ক্রিয়াকলাপ মনের কোন অন্ধকার কোণ থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। এ-ক্ষেত্রেও, তোমার বেলায়, ঠিক তা-ই করা হয়েছে। তা ছাড়াও তোমার মধ্যে আমি এমন-এক যন্ত্র দেখতে পাচ্ছি তোমার পূর্বসূরিদের কারুই যা ছিলো না : কোনো শিকারি যন্ত্রের পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক এক বহু স্মৃতির কোষাগার, কারণ এ-সব স্মৃতি সব তরুণীদের, তারা রূপসী, তারা যুবতী, আর এই লিপিবদ্ধ স্মৃতির মধ্যে আছে এমন-সব নাম এমন-সব কথা বলার ধরন, যা মনকে প্রলোভিত করে, আকৃষ্ট করে, আর এই কোষ থেকেই এক বিদ্যুৎবাহী তার চ'লে গেছে মৃত্যুহানা কোষে। আর সেই জন্যেই

তোমার মতো সর্বাঙ্গসুঠাম এমন নিখুঁত মারণ-যন্ত্র এর আগে আমি কখনও দেখিনি—হয়তো তুমিই হ'লে চূড়ান্ত মারণ-যন্ত্র—অপ্রতিরোধ্য, অমোঘ, অব্যর্থ। তোমাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস ক'রে না-ফেলে তোমার হুল সরিয়ে ফেলা তাই একেবারেই অসম্ভব।'

'আমার হুল আমার কাজে লাগবে,' তখনও আমি চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছি। 'কারণ আমাকে তো গুম-হওয়া মানুষটির সাহায্যে ছুটতে হবে।'

'তুমি সফল হবে কি না আমি জানি না,' চিকিৎসক ব'লেই চললেন, যেন আমার কোনো কথাই তাঁর কানে ঢোকেনি। 'হাজার চেষ্টা ক'রেও তুমি তোমার সেই মারণকোষের তারগুলোকে সংযত রাখতে পারবে কি না, সে সম্বন্ধে হ্যাঁ বা না কিছুই আমি বলতে পারবো না। যদি তুমি ইচ্ছে করো তবে শুধু একটি জিনিশই আমি করতে পারি—অর্থাৎ মারণকোষের তড়িৎ-প্রবাহগুলোর ওপর আমি নল দিয়ে মিহি লোহাচুর ছড়িয়ে দিতে পারি। তাতে তোমার স্বাধীনতার সীমা আরো-কিছু বেড়ে যাবে। কিন্তু আমি যদি তা করিও, একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে তুমি জানতে পাবে না যে কারু সাহায্যে ছুটে গিয়েও তুমি শেষ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবার মতো বাধ্য অস্ত্র কি না।'

তাঁরা দুজনেই আমার দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে আমি এই প্রস্তাবে রাজি হলুম। বেশিক্ষণ লাগলো না কাজটায়, তবে আমার যেমন কোনো কষ্টও হ'লো না, তেমনি আমার মনের মধ্যে কোনো অনুভূতিগম্য বদলও হ'লো না। তাঁদের আস্থা আরো বেশি ক'রে পাবার জন্য আমি রাতটা মঠেই কাটাবার অনুমতি চাইলুম—কারণ পুরোটা দিন আলোচনায়, পরীক্ষানিরীক্ষায়, গবেষণায় কেটে গিয়েছে। তাঁরা সানন্দে রাজি হলেন, কিন্তু আমি সমস্ত সময় কাটালুম সেই কাঠের চালার তন্নতন্ন পরীক্ষায়—আরহোডেসকে যারা চুরি ক'রে নিয়ে গেছে তাদের গন্ধের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে। সে-ক্ষমতা আমার ছিলো, কারণ মাঝে-মাঝে শুধু-যে শিকারই রাজার ইচ্ছা প্রতিহত করার চেষ্টা করে তা নয়—রাজার অনুজ্ঞাবাহক দ্যাখে যে অন্য-কোনো বেপরোয়া দুঃসাহসীও কাজটায় প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ভোর হবার আগে আমি সেই খড়ের বিছানায় শুয়ে পড়লুম—যেখানে নাকি আরহোডেস অনেক রাত কাটিয়েছে, আর নিশ্চল

শুয়ে তার গায়ের গন্ধে আমি আমার ভেতরটা ভ'রে নিলুম আর অপেক্ষা করতে লাগলুম সন্ন্যাসীরা কখন আসেন। কারণ আমি বিশ্লেষণ ক'রে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলুম যে তাঁরা যদি কোনো মিথ্যা গল্প ব'লে আমাকে ঠকাবার চেষ্টা ক'রে থাকেন, তবে প্রতারিত রাস্তা থেকে আমার রুষ্ট প্রত্যাবর্তনের আশঙ্কাও আছে তাঁদের, আর তাই তাঁরা যদি আমাকে ধ্বংস ক'রে ফেলতে চান তবে ভোর হবার ঠিক আগেকার অন্ধকারতম প্রহরই তাঁদের উদ্দেশ্যের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল ব'লে মনে হবে। আমি শুয়ে রইলুম, ভান করলুম যেন গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছি, অথচ এমন সজাগ আছি যে বীথিকার ক্ষীণতম খশখশে শব্দও আমার কানে এসে পৌঁছুচ্ছে, কারণ এ-সম্ভাবনাটাও অনস্বীকার্য যে তাঁরা বাইরে থেকে সব রাস্তা আটকে এই কাঠের চালায় আগুন ধরিয়ে দিতে পারেন যাতে আগুনের মধ্যে আমার আমার গর্ভের ফল আমাকে ফাটিয়ে দিয়ে দাউদাউ ক'রে জ্ব'লে ওঠে। হত্যার প্রতি তাঁদের যে স্বাভাবিক বীতস্পৃহা তাকেও তাঁদের জয় করতে হবে না, কারণ তাঁদের মতে আমি তো কোনো মানুষই নই, বরং নিছকই কোনো মারণযন্ত্র; আমার ভস্মাবশেষ তাঁরা বাগানে মাটি চাপা দিয়ে রাখতে পারবেন—আর তার ফলে তাঁদের কিছুই হবে না, এমনকী বিবেকের দংশনও ভোগ করতে হবে না তাঁদের। যদি তাঁরা আসতেন তবে আমি যে কী করতুম তা আমি জানি না, কোনোদিন জানতেও পারবো না, কারণ তাঁরা এদিকে আসেনইনি। আর তাই আমি প'ড়ে রইলুম একা, আমার নিজের চিন্তায় সুমগ্ন, আর তার মধ্যে শুধু সেই আশ্চর্য কথাগুলোই বারে-বারে বেজে যাচ্ছিলো, সেই-যে কথাগুলো বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বলেছিলেন, আমার চোখে চোখ রেখে, 'তুমি আমার ভগিনী—আমার বোন।' কী তার অর্থ, আমি তা তখনও বুঝতে পারছিলুম না, কিন্তু সেই কথাগুলো ছুঁতে-না-ছুঁতে কী যেন উষ্ণ ব'য়ে গেলো আমার শরীরে, আমাকে রূপান্তরিত ক'রে দিলো—যেন কোনো ভারি ভ্রূণ খ'শে গেলো যা আমাকে এতদিন গর্ভবতী ক'রে রেখেছিলো। সকালবেলায় আমি অবশ্য মঠের আধ-খোলা দুয়ার দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলুম, আর সন্ন্যাসীর নির্দেশমতো মঠের কাছ থেকে স'রে এলুম, সোজা ছুটলুম, পুরো দমে, দিগন্তের কাছে ধীরে-ধীরে ফুটে-ওঠা পাহাড়ের দিকে—কারণ

সন্ন্যাসী বলেছিলেন ঐ দিকেই গেছে আমার নতুন শিকারেরা।

তীব্র বেগে আমি ছুটেছিলুম। দুপুরের মধ্যেই মঠের সঙ্গে আমার ব্যবধান দাঁড়ালো একশো মাইল। শাদা বার্চ গাছের বনের মধ্য দিয়ে একটা কামানের গোলার মতো ছুটে গেলুম আমি; আর যখন পাহাড়ের তৃণভূমির মধ্য দিয়ে গেলুম, দু-পাশে ঝ'রে পড়লো ঘাস—যেন একটা বিশাল কাস্তের কোপ পড়েছে তাদের ওপর।

সেই দুই অপহরণকারীর গন্ধ আবিষ্কার করলুম এক গভীর উপত্যকায়; স্রোতস্বিনীর ওপর দিয়ে গেছে এক সেতু, আর সেই সেতুর ওপরই প্রথম গন্ধ পেলুম তাদের; কিন্তু আরহোডেসের কোনো গন্ধ নেই। তারা নিশ্চয়ই পালা ক'রে কাঁধে ব'য়ে নিয়ে গেছে তাকে, যাতে তার গন্ধ না-ছড়ায়; আর তাতে এই দুই অপহরণকারীর কূটবুদ্ধি আর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গেলো; বোঝা গেলো যে তারা জানে রাজার মারণযন্ত্রকে তার পথভ্রষ্ট করার কোনো অধিকার বা উপায় নেই কারু, অথচ আরহোডেসকে অপহরণ ক'রে তারা রাজার রোষকে তীব্রভাবে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। সন্দেহ নেই তোমরা জানতে চাইবে সেই শেষ পাল্লার দৌড়ে আমার সত্যিকার উদ্দেশ্য কী ছিলো, আর তাই তোমাদের আমি খুলে বলবো যে আমি সন্ন্যাসীদের ঠিকই ঠকিয়েছিলুম, অথচ পুরোপুরি ঠকাইওনি আবার, কারণ আমি সত্যি ফিরে পেতে—না, অর্জন করতে—চেয়েছিলুম আমার স্বাধীনতা—কারণ সত্যি-তো কখনোই আমার কোনো স্বাধীন ইচ্ছা ছিলো না। তবে সেই স্বাধীনতা নিয়ে আমি যে কী করবো, তা আমি স্পষ্ট জানি না—অতএব সে-সম্বন্ধে কোনো স্বীকারোক্তিই আমার সাজে না। এই দ্বিধা, এই অনিশ্চয়তা অবশ্য মোটেই নতুন নয়; যখন আমি আমার নগ্ন শরীরে ছুরি বসিয়েছিলুম, তখনও আমি জানিনি সত্যি কী চেয়েছিলুম আমি—আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলুম, না কি শুধুই আবিষ্কার করতে চেয়েছিলুম নিজেকে, যদিও এক অর্থে এই দুই উদ্দেশ্যই মাখামাখি ক'রে ছিলো, একটার থেকে আরেকটাকে আলাদা করা যেতো না। আমি যে তা করতে পারি, তাও আগে থেকে অনুমান করা ছিলো—পরের সব

ঘটনাই তা চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে, আর তাই এই স্বাধীনতার আশা হয়তো নিছকই এক বিভ্রম, এক মরীচিকা, আর হয়তো আমার নিজের বিভ্রম নয়, বরং আমার মধ্যে তাকে সঞ্চারিত ক'রে দেয়া হয়েছে যাতে আরো-তীব্র হ'য়ে ওঠে আমার গতি, এই প্রতারক তাড়া যাতে আমাকে আরো-ক্ষিপ্র ও কৌশলী ক'রে তোলে। অথচ যদি কেউ জিগেশ করে যে আরহোডেসকে ছেড়ে দিলেই কি স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটতো না, তবে বলবো আমি জানি না। সম্পূর্ণ স্বাধীন হ'য়েও তাকে আমি খুন করতে পারতুম, কারণ ততটা পাগল আমি হইনি যে প্রেম-বিনিময়ের সেই আশ্চর্য ও অলৌকিক ইন্দ্রজালে বিশ্বাস করবো, বিশেষত যখন আমি আর নারী নই, আর দৈবাৎ যদি এখনও কোনোভাবে আমার নারীত্ব একটুও অক্ষুণ্ণ থেকে থাকে, আরহোডেস—যে তার প্রেমিকার চেরা পেটটা দেখেছে—সে তাতে কী ক'রে বিশ্বাস করবে? আর তাই আমার স্রষ্টাদের বুদ্ধি কারিগরিবিদ্যার সর্বোচ্চ সীমাকেও ছাড়িয়ে গেছে, কারণ নিঃসন্দেহে তারা যখন সব হিশেব করেছিলো তখন এই মুহূর্তের কথাও ভেবে রেখেছিলো, ভেবে রেখেছিলো যখন জানি সে চিরকালের মতো আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে তখনও আমি তার সাহায্যে ছুটে যাবো। আর যদি উদাসীনভাবে স'রে যেতে পারতুম, যেদিকে আমার দু-চোখ যায়, তাতেও তার কোনো উপকার হ'তো না। আমি, মৃত্যুর দ্বারা বিস্ফারিত, মৃত্যুর দ্বারা গর্ভবতী, আমি নিজেই জানি না কার উদ্দেশ্যে এই উপহার। আর সেইজন্যেই আমার মনে হয় আমি যেন কোনো মহান নীচতায় ভারাক্রান্ত; সরাসরি যা করার হুকুম পেয়েছি আমার স্বাধীনতা তাকে অমান্য করবে, কিন্তু আমি সেই কাজই শেষ পর্যন্ত করবো শুধু আমার নবজন্মেরই কামনায়। কাঁটা ঝোপ, তীক্ষ্ণ কাঁটার ঝোপ—এই আমার চিন্তাগুলো। আর বিভ্রান্তিকর, অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু যখন লক্ষ্যে পৌঁছুবো তখনই সব জানা যাবে—কিসের মানে কী। অপহরণকারীদের হত্যা ক'রে আমার প্রিয়তমকে বাঁচিয়ে, তার ঘৃণা আর আতঙ্কের বদলে হয়তো, তার মধ্যে জাগিয়ে তুলবো আমার প্রতি এক অসহায় প্রশংসার চেতনা—আর তার মধ্যেই ফিরে পাবো—তাকে যদি নাও পাই—অন্তত আমার নিজেকে, নিজের একটু অংশকে।

প্রথম তরাইয়ের তলায় হেজেল গাছের নিবিড় ঝোপের মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ আমি গন্ধটাকে হারিয়ে ফেললুম। খামকাই আমি তন্নতন্ন করে খুঁজলুম তাকে, এই সে এখানে আছে, এই নেই—যেন অপহরণকারীরা আকাশে উড়ে গিয়েছে। হেজেল ঝাড়ের কাছে ফিরে এসে—খুব চেষ্টা না-ক'রেই—দেখতে পেলুম একটা ঝোপ থেকে মোটা-মোটা কয়েকটা ডাল কেটে নেয়া হয়েছে। আর তাই হেজেলের কন্দ থেকে গাছের দুধের গন্ধ শুঁকলুম কয়েকবার, তারপর যেখানে গন্ধ হারিয়ে গিয়েছিলো সেখানে ফিরে গেলুম আবার, আবিষ্কার করলুম হেজেলের একটানা দূরগামী গন্ধ, কারণ অপহরণকারীরা এখান থেকে রণপা ব্যবহার করেছে, যেহেতু তারা জানে যে ওপরের হাওয়ায় গন্ধ মিলিয়ে যাবে—বিশেষত যখন পাহাড় থেকে দমকা হাওয়ার ঝাপটা আসবে। আর আমার ইচ্ছা আরো শানিত হ'য়ে উঠলো : একটু পরেই ক্ষীণ হ'য়ে এলো হেজেলের গন্ধ, কিন্তু এখানেও আমি ধ'রে ফেললুম কী কৌশল তারা ব্যবহার করেছে—তারা রণপায়ের তলা মুড়ে দিয়েছে কেম্বিস কাপড়ে।

একটা ঝুলে-থাকা মস্ত পাথরের ওপর তারা রণপাগুলো ফেলে গিয়েছে। ফাঁকা জায়গাটা এখানে উত্তর দিকে মস্ত সব পাথরের টুকরোয় ভরা, আর তাদের ওপর গজিয়েছে শ্যাওলা, আর এমনভাবে পাথরগুলো ছড়িয়ে আছে যে শুধু পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে গিয়েই এ-জায়গাটা পেরুনো যায়। অপহরণকারীরা তাই করেছে—কিন্তু সরল রেখা ধ'রে তারা এগোয়নি। তারা এগিয়েছে আঁকাবাঁকা এলোমেলো—আর তাই আমাকে অনবরত পাথর থেকে বুকে হেঁটে নেমে ঘুরে-ঘুরে শুঁকে নিতে হচ্ছিলো হাওয়ায় ভেসে-বেড়ানো গন্ধের কণা। আর এইভাবেই আমি এসে পৌঁছলুম শৈলশ্রেণীর চূড়ায় যাবার পথে, এই উৎরাই ধ'রে উঠেছে তারা—তার মানে তারা নিশ্চয়ই আরহোডেসের বাঁধন খুলে দিয়েছিলো, কিন্তু সে যে স্বেচ্ছায় তাদের সঙ্গে এগিয়ে গেছে তাতে আমি আশ্চর্য, হইনি, কারণ তার তো সত্যি ফিরে যাবার উপায় কোনো ছিলো না। স্পষ্ট পথরেখা ধ'রে আমি চূড়ার দিকে উঠে এলুম, পাথরের তপ্ত উপরিতলে এখন তিনটি গন্ধই পাচ্ছি, যদিও খাড়া উঠতে হচ্ছিলো এখান থেকে, পাথরের খাঁজে পা রেখে, টাল শামলে, সন্তর্পণে—কোথাও ছিলো না এমন-কোনো পাহাড়ি ঝোপের উদ্গম যাকে

তারা আঁকড়ে ধরেনি, অথবা কোনো বেরিয়ে-থাকা পাথরখণ্ড, যা পায়ের তলায় ক্ষণিক নির্ভর দেয়নি তাদের ; মাঝে-মাঝেই থামতে হয়েছিলো তাদের, বিশেষত যে-জায়গাগুলো ছিলো আরো দুর্গম, তাছাড়া মাঝে-মাঝে থেমে দাঁড়িয়ে তাদের ঠিক ক'রে নিতে হচ্ছিলো কোনদিকে যাবে, আর যেখানে-যেখানে তাদের গন্ধ জট বেঁধে প্রখর হ'য়ে আছে বুঝতে পারছিলুম সেখানে তারা একটু থেমেছিলো। কিন্তু আমি নিজে ছুটে উঠছিলুম, পাথর প্রায় না-ছুঁয়েই যেন, আর অনুভব করছিলুম যে ভেতরে-ভেতরে আমার নাড়ি কঠিন হ'য়ে উঠছে ; এই গরীয়ান মৃগয়ায় সব অস্ত্র যেন গান ক'রে উঠলো, এই কথাগুলো সত্যি আমারই যোগ্য, তাদের প্রশংসা করতে ইচ্ছে হচ্ছিলো আমার, আর উল্লাস হচ্ছিলো – কারণ এই দুর্গম পথের যাত্রীরা তিনজনে মিলে যা করেছে, আমি একা অনায়াসে ঠিক তা-ই করতে পারছি, আর এই উর্ধ্বচারী রাস্তা থেকে কেউ আমাকে হঠিয়ে নিতে পারবে না—কারণ পাথরের গায়ে-গায়ে ছড়িয়ে আছে তাদের তিনজনের সম্মিলিত গন্ধ। চূড়োয় উঠে এসে এক প্রবল হাওয়ার সঙ্গে দেখা হ'লো আমার, দমকা হাওয়া অবিশ্রাম চাবকাচ্ছে চূড়োর পাথর, ছুরির ঘায়ের মতো কেটে যাচ্ছে পাথরের গা, নিচে পেছনে সবুজ যে-ভূমিচিত্র ছড়িয়ে আছে যার দিগন্ত মিলিয়ে গেছে আকাশের নীলিমায়, তার দিকে আমি একবারও ফিরে তাকালুম না, বরং শৈলশিরা ধ'রে ছুটে গিয়ে আমি দু-পাশে তাকিয়ে দেখলুম আরো-কোনো চিহ্ন আবিষ্কার করা যায় কিনা, আর শেষটায় খুব সরু একটা খাঁজের মধ্যে তাকে খুঁজে পেলুম। আর তারপরেই দেখতে পেলুম শাদাটে একটা ঘষটানির দাগ, এক জায়গায় পাথরের ধার ভেঙে গেছে, নিশ্চয়ই পা হড়কে পড়েছে পলাতকদের কেউ, আর সেই জন্য পাথরের ওপর থেকে ঝুঁকে নিচে তাকালুম আমি, আর তাকে দেখতে পেলুম, প'ড়ে আছে সে ছোট্ট রক্তাক্ত, পাহাড়ের অর্ধেক তলায়, আর আমার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা এমনকী চুনাপাথরের ওপর রক্তের দাগগুলো পর্যন্ত দেখিয়ে দিলে, যেন সেই অসাড় লোকটা আছড়ে পড়বার সঙ্গে-সঙ্গে সেখানে এক রক্তবাদল ঝরেছিলো। অন্যরা এই শৈলশিরা ধ'রেই এগিয়ে গেছে। এখন একজনেই আগলে রেখেছে আরহোডেসকে, এই চিন্তাটা আমাকে মুষড়ে ফেললো, কারণ এর আগে এতক্ষণ ধ'রে নিজের ক্রিয়াকলাপে এমন ফুর্তি হচ্ছিলো

আমার, যুদ্ধের জন্য এমন-একটা তাড়া অনুভব করছিলুম এতক্ষণ, যে তা আমাকে যুগপৎ উল্লাসে আর সংযমে ভরিয়ে রেখেছিলো। আমি ঢাল বেয়ে ছুটে নামলুম, কারণ আমার শিকার এই পথ ধ'রেই গেছে, সঙ্গীর মৃতদেহটা ফেলে গেছে পাহাড়ের কিনারেই. সন্দেহ নেই যে দারুণ তাড়া ছিলো তাদের, আর এত উঁচু থেকে পড়বামাত্র যে তক্ষুনি তার মৃত্যু হয়েছে তা নিশ্চয়ই স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিলো; আমি সেই রুক্ষ বন্ধুর গিরিসংকটের দিকে এগিয়ে এলুম, নিশ্চয়ই কোনো অতিকায় ক্যাথিড্রালের এটা ধ্বংসস্তূপ, শুধু তার বিশাল ফটকের থামগুলোই অবশিষ্ট আছে এখন, আর প'ড়ে আছে দেয়ালের পাশের আলম্বগুলো, আর উঁচু একটা জানলার ফাঁক দিয়ে আকাশ ঝলশে উঠলো একফালি, আর তার গায়ে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে—এক রোগা লম্বা গাছ; কোন অবচেতন দুঃসাহসের বশে শুধু একটা বীজ থেকে সে গজিয়ে উঠেছে - হয়তো কোনকালে ধুলোবালির সঙ্গে দেয়ালের গায়ে তাকে এনে ফেলেছিলো দমকা হাওয়ার ঝাপটা। এই গিরিসংকটের পরেই আরো-একটা, একটু উঁচুতে. আরো-সংকীর্ণ, কুয়াশায় আংশিক ঢাকা, তারও ওপরে এক চিলতে হালকা মেঘ. আর তা থেকে ঝ'রে পড়ছে মিহি তুষারকণা, ঝকঝকে, উজ্জ্বল। একটা খাপছাড়া পাথরের ছায়ার তলায় দাঁড়িয়ে আমি শুনতে পেলুম আলগা পাথরের ক্ষীণ শব্দ, তারপরেই বাজ ফেটে পড়লো, আর ঢাল বেয়ে তুলকালাম গড়িয়ে এলো ভাঙা মাটি। আমাকে পর-পর ঘুষি কষালো খণ্ড পাথর, আমার দু-পাশ থেকে ফুলকি ছুটলো, ধোঁয়া উঠলো, কিন্তু ততক্ষণে আমার পাগুলো টেনে পেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে আমি, শুয়ে পড়েছি একটা মস্ত পাথরের তলায়, ছোট্ট একটা আড়ালে, আর সেই নিরাপত্তা থেকে অপেক্ষা করেছি কখন পাথর পড়া শেষ হয়। আমার শিকার নিশ্চয়ই জানে যে এখানে মাঝে-মাঝেই উঁচু থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ে, আর ইচ্ছে ক'রেই সে এই দুর্গম পথ বেছে নিয়েছে, যাতে পাহাড়ি পথ আমার অচেনা ব'লে আমি আচমকা গড়িয়ে দেবো পাথর আর পিষে মরবো —আর যদিও এই ধারণার কোনো যুক্তিসহ সমর্থন নেই তবু আরহোডেসের এই পাহারাদার আমার ফুর্তিকে আবার বাড়িয়ে দিলে, কারণ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেবল যে আমার হাত এড়িয়ে পালাতে চাচ্ছে, তা-ই নয়, সে

আক্রমণ করতেও জানে—আর তার মানে প্রতিযোগিতা আবার উন্মাদক, তীব্র ও প্রখর হ'য়ে উঠলো।

পরের গিরিসংকটের তলদেশ তুষারে শাদা হ'য়ে আছে। আর সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা দালান, কোনো বাড়ি নয়, কোনো দুর্গ নয়, এমন-সব বিশাল পাথর বসিয়ে তৈরি যে কোনো অতিকায় দানবের পক্ষেও সে-পাথর একা নড়ানো সম্ভব হ'তো না—আর এটাই যে শত্রুর আশ্রয়স্থল, তা আমি তক্ষুনি বুঝে ফেললুম, কারণ এই বন্ধ খাঁ-খাঁ পাহাড়ি অঞ্চলে আর কোথায় তার আস্তানা হবে? আর, তাই, গন্ধের জন্য আর ব্যাকুল হলুম না, আস্তে-আস্তে নিজেকে নামিয়ে আনতে লাগলুম, খশতে-থাকা পাথরের ওপর দিয়ে পেছনের পাগুলো টেনে-টেনে, সন্তর্পণে। আমার সামনের পাগুলো প্রায় যেন গুঁড়ো পাথরের ওপর দিয়ে পিছলে যাচ্ছে, আর মাঝখানের পাগুলোকে আমি ব্যবহার করছি রাশ টেনে ধরবার জন্য, যাতে পা হড়কে থুবড়ে না-পড়ি; যতক্ষণ-না সেই প্রথম তুষারস্তূপ অব্দি পৌঁছলুম, যেখান থেকে নিঃশব্দে এগুনো যাবে, আমি রইলুম খুব সাবধান—যাতে পিছলে না-পড়ি কোনো অতল খাদের মধ্যে। সাবধান আমাকে হ'তেই হ'লো, কারণ আমার ঐ শত্রু আমাকে আশা করবে ঐ গিরিসংকট দিয়ে আসতে, আর সেইজন্যেই খুব-একটা কাছে এলুম না—যদি ঐ কেল্লার দেয়াল থেকে আমাকে কেউ দেখে ফ্যালে! আর তারপর ব্যাঙের ছাতার মতো একটা পাথরের তলায় নিজেকে কুঁকড়ে গুটিয়ে ঢুকিয়ে আমি অপেক্ষা করতে লাগলুম কখন রাত্রি নামে।

চট ক'রেই অন্ধকার নেমে এলো, কিন্তু এখনও নেমে আসছে তুষারঝুরি, আর অন্ধকারকে কেমন ফ্যাকাশে ক'রে তুলেছে; আর এই জন্যই আমি দালানটার কাছে যেতে সাহস পেলুম না, আমার পায়ের ভাঁজে মাথা গুঁজে তাকিয়ে রইলুম ঐ দালানের দিকে। যখন রাত দুপুর, তুষারপাত থামলো। কিন্তু আমি গা থেকে তুষারঝুরি ঝেড়ে ফেলবার কোনো চেষ্টাই করলুম না—এইভাবেই বরং পরিবেশের সঙ্গে আমি মিশে থাকতে পারবো। আর মেঘের ফাঁক দিয়ে যখন চাঁদের রুপো ছড়িয়ে পড়লো তখন আমার গায়ের

তুষারকে দেখালো বিয়ের পোশাকের মতো—হালকা, ধবধবে, মশলিন-মিহি, যে-পোশাক আমি কোনোদিন গায়ে দিইনি। আস্তে-আস্তে আমি বুকে হেঁটে এগিয়ে এলুম ঝাপশা দেয়ালের দিকে, একবারও দোতলার জানলা থেকে আমার চোখ সরালুম না, সেই ঘরের জানলায় হলদে আলো জ্বলছে, কিন্তু আমার চোখের পাতা আনত করলুম, কারণ চাঁদ আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে—অথচ আমি যে অন্ধকারে অভ্যস্ত। সেই ঝাপশা-জ্বলা জানলায় কী যেন নড়লো, যেন একটা ছায়া স'রে গেলো দেয়ালে, আর আমি আরো-দ্রুত করলুম আমার গতি, যতক্ষণ-না ভিৎটার পাশে এসে পৌঁছলুম। একটু-একটু ক'রে বেয়ে উঠতে লাগলুম দেয়াল, আর এ-কাজটা মোটেই কঠিন হ'লো না, পাথরের গায়ে কোনো চুনশুরকির আস্তর নেই, তারা শুধু জায়গা মতো ব'সে আছে তাদের বিপুল ওজনের চাপেই। আর এইভাবে নিচের জানলাগুলোর কাছে গিয়ে পৌঁছলুম – কালো-কালো মুখগুলো হা ক'রে আছে তারা, যেন তারা কামানের নল বসাবার জন্য তৈরি দেয়ালের গায়ে ছোটো-ছোটো সব ফোকর। হা ক'রে আছে, অন্ধকার, ফাঁকা। আর ভেতরটায় এমন স্তব্ধতা যেন যুগের পর যুগ শুধু মৃত্যুই ছিলো এখনকার একমাত্র বাসিন্দা। ভালো ক'রে দেখবার জন্য আমি নিশাচর চোখগুলোর তড়িৎপ্রবাহ সক্রিয় ক'রে দিলুম, আর পাথরের ঘরের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে খুললুম আমার সর্বশোষক শুণ্ডের জ্বলন্ত চোখগুলো – আর তা থেকে ফসফরের আভা বেরিয়ে এলো। দেখলুম তাকিয়ে আছি উবড়ো-খাবড়ো পাথরে তৈরি এক নোংরা চুল্লির দিকে, কতকাল আগে ঠাণ্ডা-হওয়া কাঠের টুকরো আর ঝলশানো ডালপালা প'ড়ে আছে তাতে। দেখতে পেলুম একটা কাঠের বেঞ্চি, দেয়ালের কাছে প'ড়ে আছে জং-ধরা সব বাসনকোশন, দোমড়ানো একটা বিছানা, আর এককোণায় শক্ত বাসি রুটির টুকরো। এই-যে আমি ঢুকে যাচ্ছি ভেতরে, অথচ কেউ আমাকে বাধা দিচ্ছে না—এটা আমাকে ভারি অবাক ক'রে দিলো, শূন্যতার এই হাতছানি আমার মোটেই ভালো লাগলো না; যদিও ঘরের অন্য কোণায় দরজাটা হাট ক'রে খোলা – হয়তো সেটাই প্রমাণ যে এটা একটা ফাঁদ—আমি যে-পথ দিয়ে এসেছিলুম সে-পথ দিয়েই বেরিয়ে গেলুম, কোনো শব্দ না-ক'রেই, সন্তর্পণে, ওপরতলায়

বেয়ে উঠবো ব'লে। যে-জানলাটা দিয়ে ক্ষীণ আলোর রেশ ভেসে আসছে—আমি সে-জানলাটার ধারে-কাছে যাবারই চেষ্টা করলুম না। অবশেষে হাৎড়ে উঠলুম আমি ছাতের ওপর, দেখলুম যে ছাতটা তুষারে-ছাওয়া, শুয়ে রইলুম আমি পাহারাদার সজাগ কুকুরের মতো, টানটান, উৎকর্ণ, চোখ-খোলা, কখন দিন আসে তার অপেক্ষায়। দুটি গলার শব্দ ভেসে এলো কানে, কিন্তু তারা যে কী বলাবলি করছে, বুঝতে পারলুম না। শুয়ে রইলুম নিশ্চল—একই সঙ্গে ভয় পাচ্ছি অথচ কামনা করছি সেই মুহূর্তটাকে যখন আরহোডেসকে মুক্তি দেবার জন্য আমি ঝাঁপিয়ে পড়বো আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর, যেন একটা টান-টান তারের কুণ্ডলী; নিঃশব্দে আঁকবার চেষ্টা করলুম সেই দ্বৈরথের চেহারাটা যার অবসান হবে হুলের বিষে; সেই সঙ্গে নিজের ভেতরটার দিকেও তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করলুম আমি: এখন আর সেখানে কোনো ইচ্ছাশক্তির উৎস খুঁজে দেখার চেষ্টা করছি না আমি, বরং হাৎড়ে পেতে চাচ্ছি ছোট্ট কোনো লক্ষণ, কোনো ইঙ্গিত, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো ইশারা, যে আমাকে ব'লে দেবে শুধু একজনকেই খুন করবো কিনা আমি। বলতে পারি না কখন এই ভয় আমাকে ছেড়ে গেলো। আমি প'ড়ে রইলুম, দ্বিধাতুর, অনিশ্চিত, নিজেকে জানি না ব'লে দোদুল্যমান—অথচ আমার এই অজ্ঞতাই—এই-যে আমি জানি না আমি উদ্ধারকর্ত্রী না আততায়ী—এই অজ্ঞতাই হ'য়ে উঠলো এমন-একটা নতুন-কিছু, অজ্ঞাত, ব্যাখ্যাতীত, অথচ নবীন, যে আমার শিহরনের মধ্যে ঢেউ খেলে গেলো কুমারীর রহস্যময় ও সচকিত প্রত্যাশার শুদ্ধতা—আমাকে তা এক অপরিচিত উল্লাসে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। আর এই উল্লাস আমাকে আবারও অবাক ক'রে দিলে: এ কি তবে আমার উদ্ভাবকদের দূরদর্শিতার আরো-একটা প্রকাশ, যারা আগে থেকেই জানে যে মুক্তি আর মৃত্যুর এই মিলনমুহূর্তে আমি এক অপরিসীম শক্তির প্লাবন অনুভব করবো—কিন্তু এটাও তো আমি সঠিক জানি না। হঠাৎ একটা ছোট্ট আওয়াজ হ'লো, তার পরেই ভেসে এলো কার কলকোলাহল, নিচে থেকে ভেসে এলো এই শব্দ—আরো-একটা শব্দ, ধপ ক'রে কিছু পড়লো, যেন ভারি কিছু থুবড়ে পড়লো হঠাৎ, বেটাল, তারপর সব চুপ। আমি ছাত থেকে বুকে হেঁটে নামতে শুরু করলুম,

আমার তলপেটকে প্রায় দু-ভাগে ভাগ ক'রে দিলুম, বুকের দিকটা দিয়ে আঁকড়ে আছি দেয়াল, আর আমার পেছনের পা আর হুল তখনও প'ড়ে আছে ছাতের কিনারে, তারপর আমার মাথা তুলে উঠলো এই চেষ্টায়, আর ঝুলতে-ঝুলতে আমি পৌঁছলুম খোলা জানলায়।

মোমবাতি ছিটকে পড়েছে মেঝেয়, নেভা। শুধু সলতেটায় তখনও লালচে আভা। আর আমার নিশাচর চোখকে সজাগ ক'রে দিয়ে আমি দেখতে পেলুম টেবিলের তলায় প'ড়ে আছে কার শরীর, আধশোয়া, রক্ত ঝ'রে পড়ছে অনর্গল, সেই আলোয় তার রং কালো আর আমার ভেতরকার সবকিছুই যখন ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠেছে, তখনও প্রথমে আমি রক্তের গন্ধ শুঁকে দেখলুম : একে তো আমি চিনি না, এ তো আমার অপরিচিত, আর তার মানে এখানে একটা দ্বৈরথ ঘ'টে গেছে আর আরহোডেস তাকে আমার আগেই বধ করেছে। কেন, কখন, কেমন ক'রে—এ-সব প্রশ্ন আমার মাথায় ঢুকলোই না, কারণ তথ্য এখন একটাই, আমি আর সে-ই শুধু আছি এখানে, একা, আর সে বেঁচে আছে এখনও ; এই ফাঁকা বাড়িটায় এখন শুধু আমরাই আছি, শুধু আমরা দুজন – আর তথ্যটা বাজের মতো আঘাত করলে আমাকে। আমি কেঁপে উঠলুম – আমি, যে একই সঙ্গে দুই, নববধূ আর আততায়ী—আর অপলকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলুম সেই বিশাল শরীরের শেষ সাবলীল ছান্দসিক বিক্ষেপ, যখন তার শেষ নিশ্বাস পড়লো। এখনও যদি আমি চ'লে যেতে পারি, আস্তে, চুপিচুপি, সন্তর্পণে বেরিয়ে যেতে পারি তুষার আর পাহাড়ের জগতে – যদি পারি ! না, তার মুখোমুখি পড়ার চেয়ে অন্য যা-কিছু – তার মুখ আর আমার শুঁড় ! মুখোমুখি কথাটার মানে তো তাই – আমি ফিশফিশ ক'রে জুড়ে দিলুম - আমি যা-ই করি না কেন, কোনো পরিত্রাণ নেই—এই পরিস্থিতি যুগপৎ দানবিক আর হাস্যকর—তার মুখ আর আমার শুঁড় !—আর ঠাট্টা, বিদ্রূপ, টিটকিরির এই বোধ পাল্লা ভারি ক'রে দিয়ে এমন-এক সজোর ধাক্কা দিলে আমায় যে আমি পিছলে নেমে এলুম, মাথাটা তলায়, যেমন নেমে আসে মাকড়শা তার সুতো বেয়ে, জানলার গোবরাটে আমার উদরের পাতগুলোর কী হ'লো তার কোনো তোয়াক্কা না-রেখেই,

আর হালকা এক লাফে নেমে এলুম মৃতদেহের ওপর, তারপরে দরজায়।

জানি না কেমন ক'রে, জানি না কখন, ভেঙে ফেলেছিলুম ঐ বন্ধ দুয়ার। চৌকাঠের ওপর চিৎ প'ড়ে আছে আরহোডেস, তার মাথাটা দোমড়ানো। জীর্ণ পাথরে হেলান দেয়া, নিশ্চয়ই তারা এই সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছিলো, সেই জন্যই নিশ্চয়ই কোনো শব্দই আমার কাছে পৌঁছোয়নি ; তাহ'লে এখানে প'ড়ে আছে সে অবশেষে, আমার পায়ের তলায়, তার পাঁজর নড়ছে, দেখতে পেলুম আমি – হ্যাঁ – তার নগ্নতা, যে-নগ্নতাকে কোনোদিন আমি জানিনি, কোনোদিন যাকে আমি ছুঁয়ে বিহ্বল হ'য়ে পড়িনি, আমি শুধু যাকে অনুমান করেছিলুম, সেই প্রথম রাতে, সেই বলনাচের আসরে।

ঘড়ঘড় ক'রে উঠলো তার গলা, তাকিয়ে-তাকিয়ে সে চোখের পাতা খোলবার চেষ্টা করছে, তারপর খুলে গেলো চোখের পাতা, প্রথমে দেখা দিলে চোখের শাদা, আর আমি, পেছিয়ে, তলপেট বেঁকিয়ে, তাকিয়ে রইলুম তার ওপরেফেরানো মুখের দিকে, সাহস নেই তাকে ছুঁই, সাহস নেই যে পেছিয়ে আসি, কারণ যতক্ষণ সে বেঁচে থাকবে আমি তো কখনও নিজেকে জানতে পারবো না ; যদিও প্রত্যেকটা নিশ্বাসের সঙ্গে গলগল ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছে তার রক্ত, তবুও আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম আমার দায়িত্ব প্রসারিত হ'য়ে আছে একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, কারণ মরণের কোলেও তো রাজার অনুজ্ঞা পালন ক'রে যেতে হবে, আর সেইজন্যেই কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না আমি, বিশেষত যতক্ষণ সে বেঁচে আছে, আর এও তো আমি জানি না যে আমি সত্যি-সত্যি কামনা করি কি না সে জেগে উঠুক। সে কি তার চোখ খুলেছিলো, তার কি চেতনা ছিলো, আর – তার ওলোটপালোট চোখে – সে কি পুরোপুরি দেখেছিলো আমাকে, হুবহু কীভাবে আমি দাঁড়িয়েছিলুম অসহায়ভাবে দুর্বলভাবে মৃত্যুকে বহন ক'রে, মিনতির ভঙ্গিতে, গর্ভবতী, কিন্তু তার ঔরসে নয়, ঐ চাহনি – সে কি ছিলো আমাদের বিয়ের মুহূর্ত, শুভপরিণয়, শুভদৃষ্টি, না কি নির্দয় নির্মম সুনির্দিষ্ট একটা তিক্ত ঠাট্টা ?

কিন্তু সে তার চোখ খোলেনি সচেতনভাবে, আর যখন সকাল এসে ঢুকলো আমাদের মধ্যে, জানলা দিয়ে উড়ে এলো ঝলমলে মিহি তুষারঝুরির ঝাপটা, আর পাহাড়ের তুষারঝড়ে সারা বাড়ি ডুকরে উঠলো, হাহাকার

ক'রে উঠলো, গরগর ক'রে উঠলো, সে আরো-একবার কাৎরালো, তারপর আর তার নিশ্বাস পড়লো না, আর তখন, শুধু তখন, যখন আমার মন অবশেষে বিশ্রাম পেলো, শান্তি পেলো, আমি আস্তে গিয়ে তার পাশে শুয়ে পড়লুম, আমার বাহুতে জড়িয়ে ধরলুম তাকে, ঢেকে দিলুম তার শরীর, আর এইভাবেই শুয়ে রইলুম আমি, আলোয় আর অন্ধকারে, আর দু-দিন ধ'রে হাহাকার করলো তুষারঝড়, শুধু হাহাকার, আর শেষে এই তুষারই ঢেকে দিলে আমাদের বাসরশয্যা, এমন-এক কাফনে যেটা আর গললো না।

আর, তৃতীয় দিনে, উঠে এলো সূর্য।